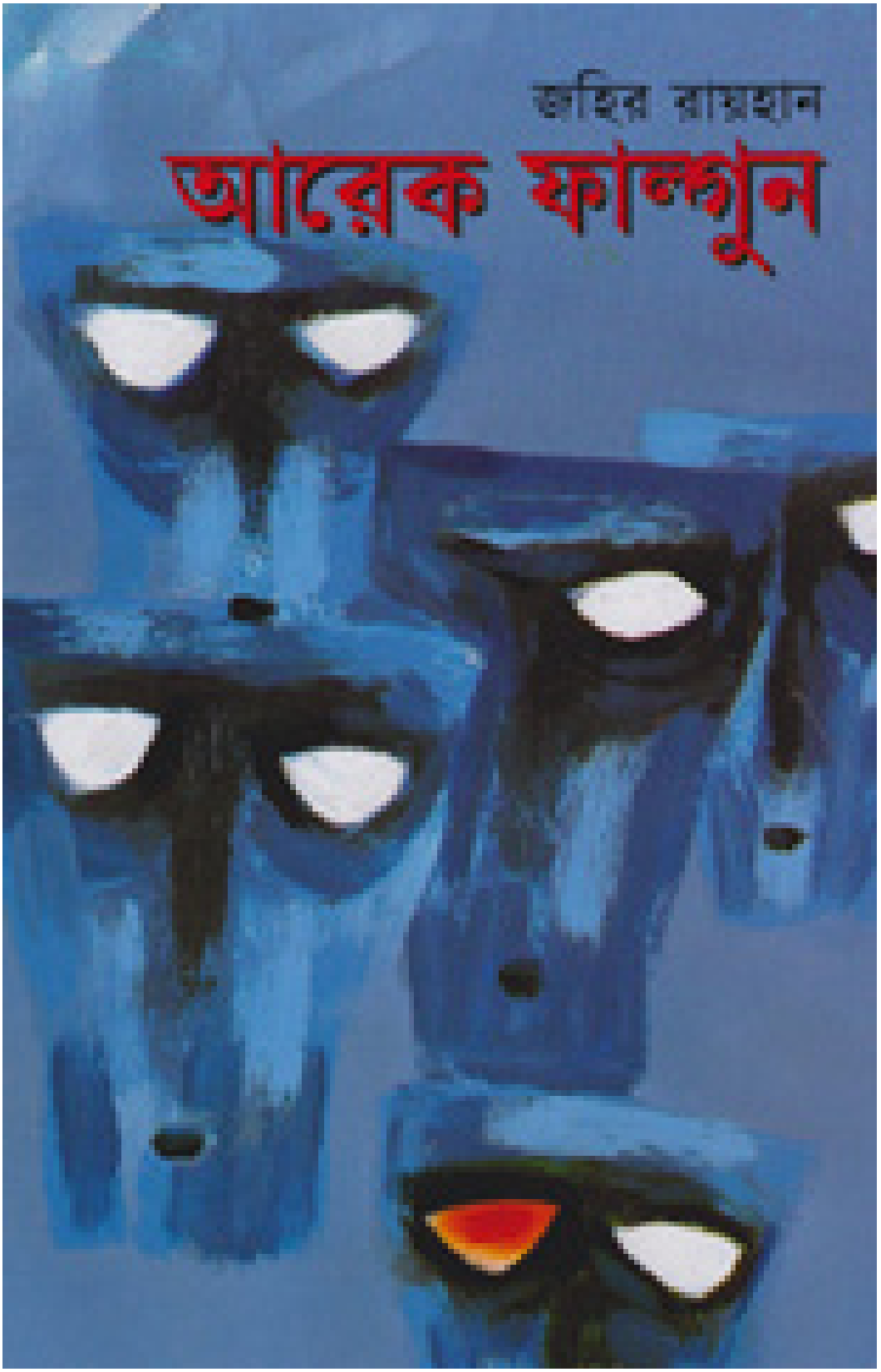
জহির রায়হান
আরেক ফাল্গুন

একটু পরে হোস্টেলের ভেতরে কয়েকটা কাঁদুনে গ্যাস ছুড়ে মারলো ওরা। মেডিকেলের ছেলেরা বোকা নয়। তাঁরা সব জানে। কাঁদুনেগুলো ফাটবার আগে সেগুলো তুলে নিয়ে পরক্ষণে পুলিশের দিকে ছুড়ে মারলো তারা। রাস্তায় ওপাশে কতগুলো ছোট ছোট রেস্তোরাঁ আর হোটেল ছিলো। পুলিশের কর্তারা তার পেছনে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নিলো। মেডিকেলের পশ্চিমপাশ দিয়ে যে-রাস্তাটা এ্যাসম্বলি হাউস ছুঁয়ে রেসকোর্সের দিকে গেছে—সে রাস্তায় মোড়ে, জিপগাড়িসহ জনৈক এম.এল.এ.-কে তখন ঘিরে দাঁড়িয়েছে একদল ছেলে। বেচারা এম.এল.এ. তাদের হাতে পড়ে জলে-ভেজা কাকের মতো ঠকঠক কাঁপছিলো আর অসহায়ভাবে তাকাচ্ছিলো এদিক-সেদিক। আশেপাশে যদি একটা পুলিশও থাকতো।

ছেলেরা জিপ থেকে নামালো তাকে। একটা ছেলে তার আচকানের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে হেঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেললো পকেটটা। আরেকটা ছেলে চিলের মতো ছোঁ মেরে তার মাথা থেকে টুপিটা তুলে রাস্তায় ফেলে দিলো। লোকটা মনের ক্ষোভ মনে রেখে বিড়বিড় করে বললো, আহা করছেন কী? করছেন কী?

আমি আর বরকত মাইকের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ বরকত বললো, দাঁড়াও আমি একটু আসি। বলে গেটের দিকে যেখানে ছেলেরা জটলা বেঁধে তখনো শ্লোগান দিচ্ছিলো, সেদিকে এগিয়ে গেলো সে। সূর্য তখন হেলে পড়েছিলো পশ্চিমে। মেঘহীন আকাশে দাবানল জ্বলছিলো। গাছে গাছে সবুজের সমারোহ। ডালে ডালে ফাল্গুনের প্রাণবন্যা। অকস্মাৎ সকলকে চমকে দিয়ে গুলির শব্দ হলো।

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম। একটা ছেলের মাথায় খুলি চরকির মতো ঘুরতে ঘুরতে প্রায় ত্রিশহাত দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লো। আরেকটি ছেলে যেখানে দাঁড়িয়েছিলো মুহূর্তে সেখানে লুটিয়ে পড়লো। আরেকপ্রস্থ গুলি ছোড়ার শব্দ হলো একটু পরে।

আরেক প্রস্থ।

একটা ছেলে তার পেটটাকে দু-হাতে চেপে ধরে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লো বারো নম্বর ব্যারাকের বারান্দায়। চোখজোড়া তার ফ্যাকাশে হতবিহ্বল। আরো তিনটি ছেলে বুকে হেঁটে সে-বারান্দার দিকে এগিয়ে এলো। তাদের কারো হাতে লেগেছে গুলি। কারো হাঁটুতে।

বরকতের গুলি লেগেছিলো উরুর গোড়ায়। রক্তে সাদা পাজামাটা ওর লাল হয়ে গিয়েছিলো। আমরা চারজনে ধরাধরি করে ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। পথে সে স্বাভাবিকভাবে কথা বলেছিলো। বলেছিলো, তোমরা ঘাবড়িয়ো না, উরুর গোড়ায় গুলি লেগেছে, ও কিছু না। আমি সেরে যাবো।

সে রাতে, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা গিয়েছিলো সে।

অনেকক্ষণ পর কবি রসুল থামলো। কী গভীর বিষাদে ছেয়ে গেছে তার মুখ। একটু পরে বিষাদ দূর হয়ে সে-মুখ কঠিন হয়ে এলো।

এনাটমির ক্লাশটা শেষ হতে নার্সেস কোয়ার্টারে মালতীর সঙ্গে দেখা করতে গেলো সালমা। মালতী তখন স্নান সেরে মাথায় চিরুনি বুলোচ্ছিলো বসে বসে। তাকে আসতে দেখে মৃদু হেসে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললো, বোসো।

সালমা বসলো।

মালতী বললো, ক্লাশ থেকে এলে বুঝি ?

সালমা সায় দিলো, হ্যাঁ। তারপর বললো, এ মাসের টাকাটা নিতে এলাম।

মালতী বললো, বোসো দিচ্ছি। চিরুনিটা নামিয়ে রেখে সুটকেসটা খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করলো মালতী। তারপর নোটটা সালমার হাতে তুলে দিয়ে মালতী চাপা গলায় আবার বললো, আজকে তোমরা রোজা রাখোনি ?

রেখেছি।

সবাই ?

হ্যাঁ সবাই। তুমি রেখেছো ?

হ্যাঁ। চিরুনিটা আবার তুলে নিয়ে বিছানায় এসে বসলো মালতী। আস্তে করে বললো, তোমরা তো তবু ভোররাতে খেয়েছো। এখানে আমরা যে ক'জনে রোজা রেখেছি, ভোর– রাতে খেতে পারিনি। জানো তো ভাই, চাকরি করি। রোজা রেখেছি শুনলে অমনি চাকরি নট হয়ে যাবে। বলতে গিয়ে ম্লান হাসলো সে। রওশনের কোনো চিঠি পেয়েছো ?

পেয়েছি।

কেমন আছে সে ?

ভালো।

তোমার দাদা ?

গ্যাস্ট্রিক আলসারে ভুগছে।

এখন কোন্ জেলে আছেন তিনি ?

রংপুর।

একটু পরে মালতীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নার্সেসকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এলো সালমা।

মেডিকেলের গেটে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিলো আসাদ। দূর থেকে ওকে দেখলো সে। ওর সঙ্গে একদিনের মেলামেশায় অনেক কিছু জানতে পেরেছে সালমা। ঘরে মা নেই, বাবা আছেন। তিনি খুব ভালো চোখে দেখেন না তাকে। রাজনীতি করা নিয়ে সবসময় গালাগালি দেন। একবার তাকে সাজা দেবার জন্যে ইউনিভার্সিটির খরচপত্র বন্ধ করে দিয়েছিলেন। একদিনে তার কাছে অনেক কিছু জানতে পেরেছে সালমা। ছেলেটি জানেশোনে বেশ। কাল ভোররাতে ভাত খেতে বসে অনেকক্ষণ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলো ওর সঙ্গে। ওর কথা বলার ভঙ্গিটা অনেকটা রওশনের মতো। তবে বড় লাজুক। চোখজোড়া সবসময় মাটির দিকে নামিয়ে রেখে কথা বলে।

কাছাকাছি এসে সালমা বললো, আসতে একটু দেরি হয়ে গেলো. কিছু মনে করবেন না।

না, মনে করার কী আছে। পরক্ষণে জবাব দিলো আসাদ।

সালমা বললো, সেই ইস্তেহারগুলো মুনিম ভাইকে পৌঁছে দিয়েছেন তো ?

আসাদ বললো, দিয়েছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সালমা আবার বললো, কাল রাতে পেট ভরে ভাত খাননি। এখন খুব কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়।

খাইনি কে বললো, পেট ভরেই তো খেয়েছি। শুধু শুধু আপনি—। চোখজোড়া তখনো মাটিতে নামানো। কথা বলতে গেলে হঠাৎ রওশনের মতো মনে হয়, বিশেষ করে ঠোঁট আর চিবুকের অংশটুকু। সালমা একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো।

পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক বের করে হাতে তুলে দিলো আসাদ। নিন, যে-জন্যে এসেছিলাম। প্রায় গোটা পঞ্চাশেক কালো ব্যাজ আছে এর ভেতর। এতে হবে তো?

হ্যাঁ হবে। সালমা ঘাড় নাড়লো।

তাহলে আপনার সঙ্গে কাজ আমার আপতত শেষ। এখন চলি। রাতে আবার দেখা হবে।

কালো পতাকার কী হলো? পেছন থেকে প্রশ্ন করলো সালমা।

এখনো দরজির দোকানে। রাতে আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তখন পাবেন। বলে দ্রুতপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগিয়ে গেলো আসাদ। নীলা, বেনু আর ওদের সঙ্গে একটি অপরিচিতা মেয়েকে এগিয়ে আসতে দেখে, ওদের জন্যে দাঁড়ালো সালমা।

নীলা বললো, কী সালমা, কাল আমাদের হোস্টেলে যাবে বলেছিলে। কই গেলে নাতো? চলো এখন যাবে।

সালমা বললো, যাবার ইচ্ছে ছিলো, সময় করতে পারিনি।

ওদের সঙ্গে পথ চলতে গিয়ে ওর নজরে পড়লো নীলা আর বেনুর পরনে দুটো কুচকুচে কালো শাড়ি। বাতাসে শাড়ির আঁচলগুলো পতাকার মতো পতপত করে উড়ছে। বাহ্, চমৎকার।

নীলা অবাক হয়ে তাকালো, কী?

ইশারায় দেখিয়ে সালমা জবাব দিলো, তোমাদের শাড়ি।

হ্যাঁ। নীলা মৃদু হাসলো। কালো ব্যাজ-পরা ব্যান্ করেছে। আর তাই আমরা কালো শাড়ি পরেছি। দেখি, ওরা আমাদের শাড়ি পরা ব্যান্ করতে পারে কিনা।

বেনু এতক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবছিলো। আসাদ সাহেবকে আপনি কতদিন থেকে চেনেন?

সালমা ঠিক এ-ধরনের কোনো প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিলো না। ইতস্তত করে বললো, মাত্র চব্বিশঘণ্টা, তাও পুরো হয়নি। কিন্তু কেন বলুন তো?

না এমনি। বেনু দৃষ্টিটা অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে বললো, আপনার সঙ্গে দেখলাম কিনা তাই।

কথা বলতে বলতে চামেলী হাউসের কাছে এসে পৌঁছলো ওরা। দূর থেকে দেখলো গেটের সামনে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে।

সালমা বললো, কেউ এলো বোধ হয়।

বেনু বললো, গতকাল অনেকে চলে গেছে হোস্টেল ছেড়ে। কারা রটিয়ে দিয়েছে একুশের রাতে পুলিশ হোস্টেলে হামলা করবে, সে খবর শুনে। সালমা অবাক হলো, তাই নাকি?

দুটো সুটকেস আর একটা বেডিং এনে তোলা হলো ছাদের ওপর। যে-মেয়েটা চলে যাচ্ছিলো তার দিকে এগিয়ে নীলা বললো, তুইও চললি বিলকিস?

মেয়েটার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো, চোখ তুলে ওদের দিকে তাকাতে পারলো না সে। শুধু ইশারায়, অদূরে দাঁড়ানো ভদ্রলোককে দেখিয়ে আস্তে করে বললো, চাচা এসেছে নিয়ে যেতে। বলতে গিয়ে গলাটা কেঁপে উঠলো তার অসহায়ভাবে।

ইউনিভার্সিটিতে এসে প্রথমে মুনিমের খোঁজ করলো আসাদ। ভার্সিটির ভেতরটা কালকের চেয়ে আজকে আরো সরগরম। চারপাশে ছেলেরা জটলা বেঁধে ধর্মঘটের কথা আলোচনা করছে।

এমনি একটা জটলার পাশে এসে দাঁড়ালো আসাদ।

একটা ছেলে বললো, তুমি যা ভাবছো, কিছু হবে না, দেখবে কাল রাস্তায় একটা ছেলেকেও বেরুতে দেবে না ওরা।

আরেকজন বললো, অবাক হবার কিছু নেই। কাল হয়তো কারফিউ দেবে।

তৃতীয়জন বললো, আজকেও কি কম পুলিশ বেরিয়েছে নাকি রাস্তায়। পল্টনের ওখানে চার-পাঁচ লরী পুলিশ দেখে এলাম।

প্রথমজন ওকে শুধরে দিলো। তুমি যে একটা আস্ত গবেট তাতো জানতাম না মাহের। আরে, ওগুলো পুলিশ নয়, মিলিটারি। ওখানে তাঁবু ফেলেছে।

কাল এতক্ষণে দেখবে, পুলিশ আর মিলিটারি দিয়ে পুরো শহরটা ছেয়ে ফেলেছে ওরা। দ্বিতীয়জন গম্ভীরভাবে রায় দিলো এবার।

মুনিমের দেখা পেয়ে আসাদ আর দাঁড়ালো না সেখানে।

মধুর রেস্তোরাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আরেক দল ছেলেকে কী যেন বোঝাচ্ছে মুনিম। তেলবিহীন চুলগুলো দস্যিছেলের মতো নেচে বেড়াচ্ছে কপালের ওপর। চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ।

আসাদ বললো, তোমায় খুঁজছিলাম মুনিম।

কেন ? কী ব্যাপার ? পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলো সে।

আসাদ বললো, শুনলাম, কাল রাতে তোমাদের বাসায় পুলিশের হামলা হয়েছিলো।

হ্যাঁ ঠিক শুনেছো। মুনিম মৃদু হাসলো। অবশ্য ব্যর্থ অভিসার। রাতে বাসায় ছিলাম না আমি।

অদূরে দাঁড়িয়ে ওদের আলাপ শুনছিলো সবুর। বললো, তোমার কপাল ভালো, ধরা পড়লে কি আর এ জন্মে ছাড়া পেতে ? জেলখানায় পচে মরতে হতো। রাতে কোথায় ছিলে ?

বাইরে, অন্য এক বাসায় ছিলাম।

বাসায়, না হলে, সবুর মৃদু হাসলো।

না, বাসাতেই ছিলাম। মুনিম ঘাড় নাড়লো।

সবুর বললো, আমাকেও দেখছি আজ রাতে বাইরে কোথাও থাকতে হবে। বাসার আশেপাশে গত ক'দিন ধরে টিকটিকির উপদ্রব বড় বেড়ে গেছে।

মুনিম কী যেন বলতে যাচ্ছিলো। সহসা সামনের লন দিয়ে হেঁটে-যাওয়া একটি মেয়ের দিকে চোখ পড়তে ডলির কথা মনে পড়লো ওর। ডলির সঙ্গে কয়েক মুহূর্তের জন্যে হলেও দেখা করা প্রয়োজন। সবুরের হাতঘড়িটার দিকে একপলক তাকালো মুনিম। এর মধ্যে দুটো বেজে গেলো, আমাকে একটু ভিকটোরিয়া পার্ক যেতে হবে।

পাগল নাকি। আসাদ রীতিমতো ধমকে উঠলো। এখন তুমি ইউনিভার্সিটি এলাকা ছেড়ে কোথায়ও যেতে পারবে না। বাইরে পা দিলেই ধরবে।

ঠিক বলেছো আসাদ। রাহাত সমর্থন জানালো তাকে। এখন এ-এলাকার বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না আপনার। তাছাড়া, নবকুমার আর নবাবপুর হাইস্কুলের ছেলেরা একটু পরে দেখা করতে আসবে। আপনি না থাকলে চলবে কী করে ?

অগত্যা ডলির সঙ্গে দেখা করার চিন্তেটা মুলতবি রাখলো মুনিম। কিন্তু জাহানারাকে একখানা চিঠি না লিখলে নয়। রাহাতের হাত থেকে খাতাটা আর আসাদের পকেট থেকে কলমটা টেনে নিয়ে মধুর রেস্তোরাঁর এককোণে বসে চিঠি লিখতে বসল মুনিম।

গতকাল রাতে আমাদের বাসা সার্চ হয়েছে। খবরটা হয়তো ইতিমধ্যে পেয়েছো। এখন থেকে কিছুদিনের জন্যে বাসায় যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। শুনলাম মা খুব কান্নাকাটি করছেন। মাকে সবকিছু বুঝিয়ে সান্ত্বনা দেবার ভার তোমার উপরে রইলো। আশা করি এ-চিঠি পেয়ে তুমি একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করবে আজ রাতে। আর তোমাদের ওখানে যাবো না। হোস্টেলে থাকবো।

এখানে এসে চিঠিটা শেষ করেছিলো মুনিম।

পুনশ্চ দিয়ে আবার লিখলো। কাল রাতে ডলির খবর জানতে চেয়েছিলে, ডলি ভালো আছে।

চিঠিখানা একটা ছেলের মারফত জাহানারার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে দু-হাতে মুখ গুঁজে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো মুনিম। মধুর রেস্তোরাঁয় এখন ভিড় অনেকটা কমে গেছে। কিছু ছেলে এদিকে-সেদিকে বসে।

॥ ছয় ॥

নদরঘাটের মোড়ে কবি রসুলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো লেখক বজলে হোসেনের। পরনে একটা ট্রপিক্যাল প্যান্ট। গায়ে লিনেনের সার্ট। পায়ে একজোড়া সদ্য পালিশ-করা চকচকে জুতো। লেখক বজলে হোসেন যান্ত্রিক হাসি ছড়িয়ে বললো, আরে রসুল যে, কী খবর, কোথায় যাচ্ছো?

রসুল বললো, এখানে এক দরজির দোকানে কিছু কালো কাপড় সেলাই করতে দিয়েছিলাম। নিতে এসেছি। তুমি কোথায় চলেছো?

আমি? আমার ঠিকানা আছে? বেরিয়েছি, কোথাও একটু আড্ডা মারা যায় কিনা সেই খোঁজে। এসো না, রিভারভিউতে বসে এককাপ চা খেতে-খেতে গল্প করা যাবে।

চা আমি খাবো না, রোজা রেখেছি। গম্ভীর গলায় জবাব দিলো রসুল। তরপর ওর জুতোজোড়ার দিকে কটমট করে তাকালো সে।

বজলে ভ্রূ কুঁচকে বললো, রোজা আবার কেন। যতদূর জানি এটাতো রোজার মাস নয়। পরক্ষণে বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। ও হ্যাঁ, শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে, তাই না? বলে শব্দ করে হেসে উঠলো সে। কিন্তু পরমুহূর্তে কবি রসুলের রক্তলাল চোখজোড়ার দিকে দৃষ্টি পড়তে মুখটা পাংশুটে হয়ে গেলো তার। ভয়ে ভয়ে বললো, কী ব্যাপার, অমন করে তাকিয়ে রয়েছো কেন, কী ভাবছো?

তোমার ধৃষ্টতারও একটা সীমা থাকা উচিত।

ওরা কথা শুনে মুখটা কালো হয়ে গেলো বজলে হোসেনের।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললো, দ্যাখো রসুল, আমরা হলাম সাহিত্যিক। সমাজের আর দশটা লোক মিছিল কি শোভাযাত্রা বের করে, পুলিশের লাঠি গুলি খেয়ে প্রাণ দিলে কিছু এসে যায় না। কিন্তু আমাদের মৃত্যু মানে দেশের একটা প্রতিভার মৃত্যু।

নিজের জ্ঞানগর্ভ ভাষণে অবশেষে তৃপ্তি বোধ করলো বজলে হোসেন।

ওরা কথা শুনে সমস্ত দেহটা জ্বালা করে উঠলো কবি রসুলের। আশ্চর্যভাবে রাগটা সামলে নিয়ে বললো, রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে এ-নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাইনি বজলে। আমার এখন কাজ আছে।

আমারও অনেক কাজ, বলে আর–একমুহূর্তেও সেখানে দাঁড়ালো না বজলে। চায়ের নেশা পেয়েছে ওর। রিভারভিউতে যাবে। রিভারভিউতে বসে এককাপ চা আর একটা চপ খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়লো সে। ডলির সঙ্গে এনগেজমেন্ট আছে। ভাবতে এখনো অবাক লাগে বজলের, কাল হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ডলি ওর কাছে ধরা দিলো কেন ? একি ওর ক্ষণিক দুর্বলতা, না বজলেকে সে অনেক আগে থেকে ভালবাসতো ? হয়তো কোনোটা সত্য নয়। হয়তো প্রথমটা সত্য। কাল রাতে সিনেমা দেখে ফেরার পথে ডলি যেন বড় বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। ঈষৎ কাত হয়ে মাথাটা রেখেছিলো ওর কাঁধের ওপর। বজলে ওকে আলিঙ্গন করতে চাইলে ডলি বাধা দিয়ে বলেছিলো, না। এখন আমায় এমনি থাকতে দাও বজলে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলো, কাল যদি তোমাকে ডাকি, বেড়াতে বেরুবে তো আমার সঙ্গে ?

একটু ভেবে নিয়ে ডলি জবাব দিয়েছিলো, হ্যাঁ, বেরুবো বিকেলে। যদি পারো বাসায় এসো।

বাসায় এসে বজলে দেখলো ডলি আগে থেকে সেজেগুজে বসে আছে। পরনে একটা মেরুন রঙের শাড়ি। গায়ে একটি সাদা ব্লাউজ। চুলে আজ খোঁপা বাঁধেনি ডলি, বিনুনি করে ছেড়ে দিয়েছে পিঠের ওপর। বজলে বললো, তুমি দেখেছি তৈরি হয়ে বসে আছো ! চলো।

বজলেকে দেখে মৃদু হাসলো সে।

ডলি বললো, চা খাবে না ?

বজলে বললো, খাবো। তবে ঘরে নয়, বাইরে।

রাস্তায় নেমে ডলি জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবে ?

হাতের ইশারায় একখানা রিকশা থামিয়ে বজলে জবাব দিলো, একবার রিকশায় ওঠা যাক তো। তারপর দেখা যাবে।

রিকশায় উঠে কিছুক্ষণ লক্ষ্যবিহীন ঘুরে বেড়াতে বেশ ভালো লাগলো ওদের। রেস্তোরাঁয় বসে দু–কাপ কফি আর কিছু প্যাস্ট্রি খেলো।

বজলে সিনেমা দেখার পক্ষে ছিলো। ডলি নিষেধ করলো, রোজ সিনেমা দেখতে ভালো লাগে না ওর। তার চেয়ে শহরতলীতে কোথাও বেড়াতে গেলে মন্দ হয় না।

বজলে বললো, দি বেস্ট আইডিয়া। চলো যাওয়া যাক।

ডলি বললো, চলো।

খানিকক্ষণ পর বজলে আবার বললো, সন্ধের পর মাহমুদের ওখানে যাবার কথা আছে। তুমি যাবে তো ?

ডলি বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিলো, আমি কেন ওর ওখানে যাবো ?

বজলে ওর একখানা হাত ধরে নরম গলায় বললো, ওখানে কেউ থাকবে না ডলি। আমরা নিরিবিলিতে গল্প করবো।

ডলি ঈষৎ লাল হয়ে বললো, না।

বিকেলে চা খেতে বসে শাহেদ প্রশ্ন করলো, কাল রাতে আমার বিছানায় যে শুয়েছিলো, লোকটা কে রে আপা ?

আসাদ সাহেব। ইউনিভার্সিটিতে পড়ে।

তোমাদের দলের লোক বুঝি ?

না।

ইস, না বললেই হলো। আমি দেখলে চিনিনে যেন !

চিনেছো, ভাল করেছো। এখন চুপ করো।

কেন চুপ করবো। শাহেদ রেগে উঠলো। লোকটার জ্বালায় কাল রাতে একটু ঘুমোতে পেরেছি নাকি ? ঘুমের ভেতর অমন হাত-পা নাড়তে আমি জন্মেও দেখিনি কাউকে। মাঝ-রাতে ইচ্ছে করছিলো জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিই লোকটাকে।

ওর কথা শুনে শব্দ করে হেসে উঠলো সালমা।

শাহেদ বললো, তুই হাসছিস ? আমার যা অবস্থা হয়েছিলো তখন ! শুধু কি হাত-পা ছুড়ছিলো লোকটা ? ঘুমের ঘোরে কী যেন সব বলছিলো বিড়বিড় করে। আর মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠেছিলো। উহ, কেমন করে যে রাতটা কেটেছে আমার।

হাসতে গিয়ে মুখে আঁচল দিলো সালমা। বললো, দাঁড়াও না, আজ রাতেও তোমার ওখানে থাকবে সে।

আজকেও থাকবে বুঝি ? চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো শাহেদ। তুই কি আমায় ঘর থেকে তাড়াতে চাস আপা ?

কেন, তোমার যদি ওখানে ঘুম না আসে তাহলে আলাদা বিছানা করে দেবো, সেখানে থেকো।

তাহলে তাই করে দিস। শাহেদ শান্ত হাসলো।

ওর মাথার চুলগুলোর মধ্যে হাত বুলিয়ে দিয়ে সালমা একটু পরে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁরে, আমার কোনো চিঠিপত্র এসেছে ?

শাহেদ সংক্ষেপে ঘাড় নাড়লো, না।

শুনে বিমর্ষ হয়ে গেলো সালমা। রওশনের শেষ চিঠি পেয়েছে সে অনেকদিন। এত দেরি তো কোনোবার হয় না। সালমার মনে হলো, হয়তো তার অনেক অসুখ করেছে। না হলে চিঠি লিখছে না কেন ? ভাবতে গিয়ে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো ওর।

তখন না বললেও মাহমুদের ওখানে যেতে হলো ডলিকে।

সাহানাকে নিয়ে মাহমুদ তখন বাইরে বেরুবার তোড়জোড় করছিলো। ওদের দেখে খুব খুশি হলো সে। বললো, তোমরা এসেছো বেশ ভালো হলো। চলো একসঙ্গে বেরোন যাবে।

বজলে শুধালো, কোথায় যাচ্ছো তোমরা ?

মাহমুদ বললো, সাহানা যাবে ওর এক বান্ধবীর বাসায় আর আমি একটা অফিসিয়াল কাজে।

মাহমুদকে ইশারায় একপাশে ডেকে নিয়ে এলো বজলে। তারপর ধমকের সুরে বললো, তুমি একটা আস্ত গবেট। ডলিকে নিয়ে এখানে এসেছি কেন, এ সামান্য ব্যাপারটা বোঝো না ? বলে মুচকি হাসলো সে।

ক্ষণকাল ওর দিকে তাকিয়ে ডলির দিকে এগিয়ে গেলো সে। আপনারা এখানে বসে গল্প করুন। আমি সাহানাকে নিয়ে একটু ঘুরে আসছি।

বলে আড়চোখে তাকালো সে।

ডলি ব্যস্ততার সঙ্গে বললো, আপনারা কতক্ষণে ফিরবেন ?

মাহমুদ কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিলো, এইতো যাবো আর আসবো।

সাহানা অকারণে হাসলো একটু।

ডলি সে-হাসির কোনো অর্থ খুঁজে পেলো না।

ওরা চলে গেলে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এলো বজলে। ঘরে এখন ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। এখন ইচ্ছে করলে নির্বিঘ্নে পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে পারবে ওরা।

ডলির পাশে এসে বসলো বজলে। তারপর দু-হাতে ওকে কাছে টেনে নিলো।

ডলি বিরক্তির সঙ্গে বললো, এ কী হচ্ছে ?

বজলে ওর কানের কাছে মুখ এনে বললো, এখন আর আমায় বাধা দিয়ো না ডলি।

ডলি কপট হেসে বললে, এইজন্যে বুঝি আসা হয়েছে এখানে ?

বজলে বললো, হ্যাঁ, এইজন্যে। ডলিকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলো সে। ডলি এবার আর বাধা দিলো না।

রাত আটটা বাজার তখনো কিছু বাকি ছিলো। আকাশের ক্যানভাসে সোনালি তারাগুলো মিটমিট জ্বলছে। কুয়াশা ঝরছে। উত্তরের হিমেল বাতাস বইছে ধীরেধীরে।

শাহেদের হাত ধরে ছাতে উঠে এলো সালমা।

ছোট্ট ছাত।

আরো অনেকে তখন আশেপাশের ছাতে উঠে গল্প করছিলো বসে বসে। সালমা শুনলো রাজ্জাক সাহেব তার গিন্নিকে বলছেন, দেখো আগে থেকে সাবধান করে দিচ্ছি— কাল ছেলেমেয়েদের কাউকে বাইরে বেরুতে দিয়ো না। না না, যেমন করে হোক ওদের আটকে রেখো ঘরের মধ্যে। কে জানে কাল কী হয়। হয়তো সেবারের মতো গুলি চালাবে ওরা।

শুধু রাজ্জাক সাহেব নন। সবার মুখে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ। কাল নিশ্চয় কিছু-একটা ঘটবে। কী ঘটবে কে জানে। হয়তো রক্তপাত হবে। প্রচুর রক্তপাত। সালমা শুনলো— রাজ্জাক সাহেবের গিন্নি প্রশ্ন করলো, আর কতকাল এসব চলবে বলোতো ?

রাজ্জাক সাহেব জবাব দিলেন, জানি না।

কেউ জানে না কতকাল এমনি উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে ওদের থাকতে হবে। এমনও সময় এসেছে মাঝে মাঝে, যখন মনে হয়েছে, এবার বুঝি তারা শান্তির নাগাল পেলো। কিন্তু পরক্ষণে তাদের সে ভুল ভেঙে গেছে। হিংসার নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ওরা। হতাশায় ভেঙে পড়ে বলেছে, আর পারি না।

সালমা শুনলো— রাজ্জাক সাহেব বলছেন, কতকাল চলবে সে কথা ভেবে কী হবে। তুমি ছেলেমেয়েগুলোকে কাল একটু সামলে রেখো।

গিন্নি বললেন, রাখবো।

আর অমনি সময় অকস্মাৎ সমস্ত শহর কাঁপিয়ে অযুতকণ্ঠের শ্লোগানের শব্দে চমকে উঠলো সবাই। যাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছিলো, তারা ঘুম থেকে জেগে উঠে উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করলো, কী হলো, ওরা কি গুলি চালালো আবার ?

আকাশে মেঘ নেই। তবু, ঝড়ের সঙ্কেত।

বাতাসে বেগ নেই। তবু, তরঙ্গ সংঘাত।

কণ্ঠে কণ্ঠে এক আওয়াজ, শহীদের খুন ভুলবো না। বরকতের খুন ভুলবো না।

যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। পৃথিবী কাঁপছে। ভূমিকম্পে চৌচির হয়ে ফেটে পড়েছে দিগবিদিক।

শুধু উত্তর নয়। দক্ষিণ নয়। পূর্ব নয়। পশ্চিম নয়। যেন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছাতে ছাতে, প্রতি ছাতে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-যুবক ফেটে পড়ছে চিৎকারে, শহীদ স্মৃতি অমর হোক।

সবাই বুঝলো। বুঝতে কারো বেগ পেতে হলো না। রাস্তায় শ্লোগান দেয়া নিষেধ। মিছিল শোভাযাত্রা বেআইনি করেছে সরকার। আর তাই ঘরে ঘরে ছাতের ওপরে সমবেত হয়ে শ্লোগান দিচ্ছে ওরা, ছাত্ররা। মুসলিম হল, মেডিকেল হোস্টেল, ঢাকা হল, চামেলী হাউস, ফজলুল হক হল, বান্ধব কুটির, ইডেন হোস্টেল, নুপুর ভিলা। সবাই যেন এককণ্ঠে আশ্বাস দিচ্ছে, দেশ আমার, ভয় নেই।

সালমার হাতে একটা টান দিয়ে শাহেদ বললো, গত ইলেকশনের সময়ে তোরা এমনি শ্লোগান দিয়েছিলি ছাতের ওপরে দাঁড়িয়ে, তাই না আপা?

হ্যাঁ, সালমা সংক্ষেপে জবাব দিল।

শাহেদ বললো, কী লাভ হয়েছে তোদের। যাদের ভোট দিয়ে পাঠিয়েছিল তারা তো এখন কিছু বলছে না।

উত্তরে সালমা কিছু বলবে ভাবছিল। শুনলো— রাজ্জাক সাহেব তার স্ত্রীকে বোঝাচ্ছেন, সবাইতো আর মীরজাফর নয়। ভালো লোকও আছেন। আসল কথা হলো, কে ভালো আর কে মন্দ সেটা যাচাই করে নেয়া বুঝলে।

অনেকক্ষণ একঠায় দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে ব্যথা করছিল মাহমুদের। একটা চেয়ার খালি হতে তাড়াহুড়া করে বসে পড়লো সে। হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল ন'টা বাজে গেছে প্রায়।

এতক্ষণ কিউ খানের একটানা প্রলাপ শুনতে হয়েছে। বড়কর্তার ধমক খেয়ে লোকটা রেগেছে ভীষণ। এইতো একটু আগে ইন্সপেক্টরদের সবাইকে ডেকে অবস্থা জানালেন তিনি। আমি জানতাম, আপনাদের দিয়ে কিছু হবে না। আপনারা শুধু গায়ে বাতাস দিয়ে বেড়াতে পারেন।

বড়কর্তা বললেন, কী আশ্চর্য। আপনাদের কাজের নমুনা দেখলে আমার গা জ্বালা করে ওঠে। এতকিছু ঘটে যাচ্ছে, অথচ আপনারা কিছু করতে পারছেন না।

একজন পুলিশ অফিসার হাত কচলে বললো, আমরা কী করবো স্যার! ওরা ছাতের ওপরে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিচ্ছে। আমরা হুকুমের দাস। আমরা কী করবো স্যার?

আপনারা কী করবেন মানে? বড়কর্তা ভ্রূ কুঁচকে বললেন। আপনারাই তো সবকিছু করবেন। আপনারা হচ্ছেন সাচ্চা দেশপ্রেমিক। দেশ তো আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

বড়কর্তার কথা শুনে মাহমুদ অবাকদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার দিকে। আর ভাবছিলো, সত্যি লোকটা একটা জিনিয়াস। মানুষকে কী শ্রদ্ধার চোখেই না দেখে। আমাদের প্রতি তাঁর কী গভীর মমত্ববোধ।

বড়কর্তা আবার বললেন, আপনারা নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন, কুটিকয় বিদেশের দালাল আমাদের সোনার দেশটাকে একেবারে উচ্ছন্নে নিয়ে যাচ্ছে। সর্বনাশ করছে আমাদের।

তার কথায় একজন অফিসার উৎসাহিত হয়ে বললেন, ইয়ে হয়েছে স্যার। কী যে বলবো। যেখানে যাই, সেখানে দেখি ছেলে-ছোকরারা সব জটলা বেঁধে কী সব ফুসুর-ফাসুর করছে। জানেন স্যার, লোফার এই খবরের কাগজের হকার বলুন, রিকশাওয়ালা বলুন, এমনকি সরকারি কর্মচারীদের মধ্যেও কেমন একটা সন্দেহের ভাব দেখলাম। আমাদের বিরুদ্ধে কেমন যেন একটা ষড়যন্ত্র করছে ওরা।

তাই। দেশটা একেবারে রাষ্ট্রদ্রোহীতে ভরে গেছে। কিউ খানের চোখেমুখে হতাশার ছাপ।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মাহমুদ।

সাহানা ওর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে গুলিস্তানের সামনে। তাকে নিয়ে বাসায় ফিরতে হবে। বজলে আর ডলি এখনো অপেক্ষা করছে।

শ্লোগান দেবার চোঙাগুলো সব একপাশে এনে জড়ো করে রাখলো ওরা। এতক্ষণে ছাতের ওপরে উঠে একটানা অনেকক্ষণ শ্লোগান দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সবাই। এই শীতের মওসুমেও গা বেয়ে দরদর ঘাম ঝরছে। গলার স্বর দমে গেছে। ভেঙে-ভেঙে বেরুচ্ছে গলা দিয়ে। মুনিম বললো, গরম পানিতে নুন দিয়ে গার্গেল করো, ভালো হয়ে যাবে। নইলে ব্যথা করবে গলায়। কাল আর কথা বেরুবে না।

কয়েকজন ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। ওরা বিছানায় এলিয়ে পড়লো। কেউ কেউ কাল দিনে কী ঘটতে পারে তাই নিয়ে জোর আলোচনা শুরু করল করিডোরে। কেউ ডাইনিং হলে খেতে গেলো। খাবারটেবিলেও তর্ক বিতর্ক আর আলোচনার শেষ নেই।

মাঝখানের মাঠটাও, যেখানে সুন্দর ফুলগাছের সার থরে-থরে সাজানো, ঘাসের উপরে হাত-পা ছড়িয়ে বসলো মুনিম। অনেক চিন্তার অবসরে ডলির কথা মনে পড়লো ওর। ডলির সঙ্গে একবার দেখা হলে ভালো হতো। মুনিম ভাবলো। কিন্তু পরক্ষণে আরেক চিন্তায় ডলি হারিয়ে গেলো মন থেকে। রাত শেষে ভোর হবে। আর, পুলিশ এসে হয়তো ঘিরে ফেলবে পুরো হলটাকে। এমনি ঘিরেছিলো আরেকবার। বায়ান্ন সালের পঁচিশে ফেব্রুয়ারিতে তখন এ হলটাই ছিল আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। সেদিনের কথা ভাবতে অবাক লাগে মুনিমের। রীতিমতো একটা সরকার চালাতে হয়েছিল ওদের। বজলুর পঁচিশ নম্বর রুমটা ছিল অর্থদপ্তর। ছেলেরা টাকা সংগ্রহের জন্যে কৌটো হাতে বেরিয়ে যেতো ভোরে ভোরে। রাস্তায় রাস্তায় আর বাড়ি-বাড়ি চাঁদা সংগ্রহ করে বেড়াতো ওরা। দুপুরে কৌটো ভরা আনি দুআনি আর টাকা এনে জমা দিতো অফিসে। আন্দোলনের যাবতীয় খরচপত্র সেখান থেকে চালানো হতো। বজলু ছিল এই দপ্তরের কর্তা। অর্থনীতিতে খুব ঝানু ছিল বলে ওই পদটা দেয়া হয়েছিল ওকে। নঙ ছিল ওর হেডকেরানি। কেরানীর মতোই মনে হতো ওকে।

অর্থদপ্তরের পাশে ছিলো ইনফরমেশন ব্যুরো। ওদের কাজ ছিল কোথায় কী ঘটছে তার খবর সংগ্রহ করা। ভোর হতে সাইকেলে চড়ে এই খুদে গোয়েন্দার দল বেরিয়ে পড়তো শহরের পথে। কোথায় ক'জন গ্রেফতার হলো, কোথায় অধিকসংখ্যক পুলিশ জমায়েত হয়েছে, কোন্ জায়গায় এখন হামলা চলার সম্ভাবনা আছে— এসব খোঁজ নিতো ওরা। আর কোনো খোঁজ পেলে তক্ষুনি হেডঅফিসে এসে খবরটা পৌঁছে দিতো। এ-ছাড়া আরো কয়েকটা কাজ ছিল ওদের। একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় খবর আদান-প্রদান

করা, সরকারি গোয়েন্দাদের ওপর নজর রাখা আর নিজেদের মধ্যে স্পাই আছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখা। ইনফরমেশন ব্যুরোর কর্মকর্তা ছিল আমজাদ ভাই। বড় ধুরন্ধর ছিল লোকটা। দুজন সরকারি গোয়েন্দাকে হলের মধ্যে ধরে কী মারটাই না দিয়েছিল সে। ইনফরমেশন ব্যুরোর পাশে ছিল প্রচারবিভাগের অফিস। তার পাশে খাদ্যদপ্তর। ওদের কাজ ছিলো জেলখানায় আটক বন্দিদের খাবার সরবরাহ করা।

কেন্দ্রীয় দপ্তরটা ছিল মনসুর ভাইয়ের রুমে। সেখানে বসে আন্দোলন সম্পর্কে মূলনীতি নির্ধারণ করা হতো। সেইমতে চলতো সবাই। বিকেলে অফিস-আদালত থেকে, কারখানা আর বস্তি থেকে হাজার হাজার লোক এসে জমায়েত হতো হলের সামনে। প্রচার- দপ্তর থেকে মাইকের মাধ্যমে আগামীদিনের কর্মসূচি জানিয়ে দেয়া হতো ওদের। তারপর তারা চলে যেতো। বসে বসে সে-দিনগুলোর কথা ভাবছিল মুনিম। ভাবতে বেশ ভালো লাগছিলো ওর। একটা ছেলে এগিয়ে এসে বললো, এখানে কুয়াশার মধ্যে বসে আছেন কেন, উঠুন মুনিম ভাই। আপনার জন্যে ভাত নিয়ে এসেছি রুমে। মুনিম উঠে দাঁড়ালো, চলো।

÷

সাহানাকে নিয়ে বেশ রাত করে বাসায় ফিরে এলো মাহমুদ। প্রায় রাতে এমনি দেরি হয় ওর। কোনোদিন কাজ থাকে। কোনোদিন ক্লাবে যায় আর আড্ডা মারে। জীবনটা হলো একটা সুন্দর করে সাজানো বাগানের মতো। যেদিকে খুশি ইচ্ছেমতো উড়ে যেতে পারো তুমি। কিম্বা কখনো ভ্রমর হয়ে উড়ে বেড়াতে পারো এক ফুল থেকে অন্য ফুলে।

সাহানার বাহুতে স্পর্শ করে মাহমুদ বললো, সাহানা, তুমি আমাকে খুব ভালোবাসো, তাই না?

সাহানা চোখ তুলে শুধু একবার তাকালো ওর দিকে। তারপর সংক্ষেপে বললো, হ্যাঁ।

মাহমুদ জানতো, কী উত্তর দেবে সাহানা। অতীতে এমনি আরো অনেককে প্রশ্ন করে ওই একই জবাব পেয়েছে সে। আগে রোমাঞ্চিত হতো। আজকাল আর তেমন কোনো সাড়া জাগে না মনে। তবু আবার জিজ্ঞেস করলো মাহমুদ, সত্যি ভালোবাসো?

সাহানা হেসে জবাব দিল, জানি না।

আমি জানি, মাহমুদ কেটে-কেটে বললো, আমি জানি, একদিন তুমি বাবুইপাখির মতো পলকে উড়ে চলে যাবে।

সাহানা রক্তাভ হলো। তারপর হঠাৎ গভীর হয়ে গিয়ে বললো, তাই যাবো। একজনের কাছে বেশিদিন থাকতে ভালো লাগে না আমার। গলার স্বরে তার শ্লেষ আর ঘৃণা।

মাহমুদের মনে হলো মেয়েটি বড় নির্লজ্জ। ঠোঁটের কোণে কথাটা একটুও বাধলো না।

মাহমুদ নিজেও ও-কথা বলেছে অনেককে।

সালেহাকে মনে পড়ে। টালিক্লার্কের মেয়ে সালেহা। মেয়েটা রীতিমতো ভালোবেসে ফেলেছিলো ওকে।

বোকা মেয়ে।

ওর কথা ভাবলে দুঃখ হয় মাহমুদের। অমন বিষ খেয়ে আত্মহত্যা না করলেও পারতো সে।

কিন্তু সাহানা ওর মতো বিষ খাবে না। খুব স্বাভাবিকভাবে সবকিছু নিতে পারবে সে। তবু মাহমুদের কেন যেন আজ মনে হলো মেয়েটা বড় নির্লজ্জ।

ভেতরে বাতি নেভানো ছিল। কড়া নাড়তে গিয়ে দুজনের চোখাচোখি পড়লো। মুখ টিপে একটুকরো অর্থপূর্ণ হাসি ছড়ালো সাহানা। মাহমুদও না-হেসে পারলো না। খানিকক্ষণ কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তারপর বাতি জ্বলে উঠলো। শব্দ হলো কপাট খোলার। খোলা দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে বজলে। পরিপাটি চুলগুলো এলোমেলো। মুখে ঈষৎ বিরক্তির আমেজ। ওদের দেখে বললো, কী ব্যাপার এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে?

মাহমুদ হাতঘড়িটা ওর মুখের কাছে বাড়িয়ে দিয়ে আস্তে করে বললো, খুব তাড়াতাড়ি ফিরিনি কিন্তু।

বজলে লজ্জা পেয়ে বললো, এ কী দু'ঘন্টা! আমার মনে হচ্ছিলো—।

আমারো তেমনি মনে হলো। ডলির দিকে আড়চোখে একপলক তাকিয়ে নিয়ে শব্দ করে হাসলো মাহমুদ।

নীল আলো ছড়ানো ঘরের দেয়ালে একটা টিকটিকি টিকটিক শব্দে ডেকে উঠলো। কোচের ওপর বসে দেহটা এলিয়ে দিল মাহমুদ। আলনা থেকে তোয়ালেটা নামিয়ে নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো সাহানা। ডলি দাঁড়িয়েছিলো উত্তরমুখো আলমারিটার পাশে, জানালার ধার ঘেঁষে ওদেরকে পেছন করে।

মাহমুদ বললো, কাল সকালে কি তোমার সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে বজলে?

বজলে প্রশ্ন করলো, কেন বলোতো?

মাহমুদ বললো, কিছু আলাপ ছিলো।

বজলে শুধালো, গোপনীয় কিছু।

মাহমুদ ঘাড় নাড়লো। না, ঠিক তেমন গোপনীয় কিছু নয়।

বজলে এগিয়ে এসে বসলো তার সামনে। কাল কেন, এখন বলো না।

মাহমুদ বললো, না, এখন না। কাল সকালে বরং একবার এখানে এসো তুমি, কেমন?

জানালার পাশে দাঁড়ানো ডলি ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছিলো বাইরে। সার-সার বাতি। গাড়ি আর লোকজন! সবকিছু অস্বস্তিকর মনে হলো তার। যেন এখন নিরিবিলি অন্ধকার কোণে গিয়ে লুকোতে পারলে সে বেঁচে যায়! পেছনে ফিরে তাকাতে ভয় হচ্ছে ওর। যদি মাহমুদের চোখে চোখ পড়ে তাহলে? সত্যি, ওরা কী ভাবছে কে জানে। ডলি রীতিমতো ঘামাতে শুরু করলো।

বাইরে বেরিয়ে যখন রিকশায় উঠলো ওরা, তখন ইলশেগুঁড়ির মতো বৃষ্টি ঝরছে। ডলি অনুযোগের সুরে বললো, আজ আমাকে এতবড় লজ্জাটা না দিলে চলতো না?

বজলে অপ্রস্তুত হয়ে বললো, কোতায় লজ্জা দিলাম তোমায়?

ডলি ঈষৎ রক্তাভ হয়ে বললো, জানি না।

ডলির হাতটা মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে মৃদু চাপ দিলো বজলে। চোখজোড়া ওর মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে বাইরে গাড়িঘোড়া আর লোকজন দেখতে লাগলো ডলি। রাস্তায় তেমন ভিড় নেই। যানবাহনের চলাচল অনেক কম। পথের দুপাশে দোকানগুলোতে খদ্দেরের আনাগোনা খুব বেশি নয়। সহসা ডলি চমকে উঠলো। মনে হলো ওদের রিকশার পাশ ঘেঁষে মুনিম সাইকেল নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো। কোথায় গেলো সে? কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো ডলি। এমনও হতে পারে যে, আজ বাসায় ফিরে দেখবে মুনিম তার অপেক্ষায় বসে আছে। ডলিকে কাছে পেয়ে হয়তো বলবে, অনেক

ভেবে দেখলাম ডলি। তোমাকে বাদ দিলে জীবনে আর কিছুই থাকে না। তাই, সব ছেড়ে দিয়ে তোমার কাছে ফিরে এলাম। আমাকে ক্ষমা করে দাও। বলে কাতর চোখজোড়া তুলে ওর দিকে তাকাবে সে। ডলি তখন কী উত্তর দেবে?

ভাবতে গিয়ে ঘেমে উঠলো ডলি। কিন্তু পরক্ষণে মনে হলো, এ তার উদ্ভট কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। মুনিমকে সে দেখেনি, ওটা চোখের ভুল। এ তিনদিন ওরা খালিপায়ে হাঁটাচলা করছে, সাইকেলে নিশ্চয় চড়বে না মুনিম। ভাবতে গিয়ে কেন যেন বড় হতাশ হলো ডলি।

বজলে ওর হাতে একটা নাড়া দিয়ে বললো, কী ব্যাপার, চুপচাপ কী ভাবছো।

ডলি আরো একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বললো, ওরা স্বামী-স্ত্রী তাই না?

ওরা কারা? কাদের কথা বলছো? বজলে অবাক হয়ে তাকালো ওর দিকে।

ডলি বললো, সাহানা আর মাহমুদ।

বজলে কিছু ভেবে বললো, হ্যাঁ ওরা স্বামী-স্ত্রী। এই তো মাসকয়েক হলো বিয়ে হয়েছে তাদের। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

না, এমনি। বজলের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল ডলি।

॥ সাত ॥

সারারাত এক লহমার জন্যে ঘুমোল না ওরা।

মেডিকেল হোস্টেল, মুসলিম হল, চামেরী হাউজ, ইডেন হোস্টেল, ফজলুল হক হল। সতর্ক প্রহরীর মতো সারারাত জেগে রইলো ওরা। কেউবা জটলা বেঁধে কোরাসে গান গাইলো— ভুলবো না, ভুলবো না একুশে ফেব্রুয়ারি।

কেউ গাইলো— দেশ হামারা।

ফজলুল হক হলটাকে বাইরে থেকে দেখতে মোঘল আমলের দুর্গের মতো মনে হয়। আস্তরবিহীন ইটের দেয়ালগুলো রক্তের মতো লাল। তিনতলা দালানটা চৌকোণো, মাঝখানে দুর্বাঘাস-পাতা প্রশস্ত মাঠ। দু-পাশে বাগান। মাঠের ওপর ছেলেরা কাগজের স্মৃতিস্তম্ভ গড়তে বসলো। বাঁশের কঞ্চি এলো। রঙ তুলি সবকিছু নিয়ে কাজে লেগে গেলো ওরা। অদূরে কালো পতাকা আর কালো ব্যাজ বানাতে বসলো আরেক দল ছেলে। ঘন অন্ধকারে ছায়ার মতো মনে হলো ওদের।

তিনতলা থেকে কে একজন ডেকে বললো, একটু অপেক্ষা করো। আমরা আসছি।

অপেক্ষা করার সময় নেই। নিচে থেকে কবি রসুল জবাব দিল। রাতারাতি শেষ করতে হবে সব। তোমরা তাড়াতাড়ি এসো।

আরেকজন বললো, আসতে আঁঠার টিনটা নিয়ে এসো মাহের।

এমনি, আরো একটা রাত এসেছিলো বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে। পরিকল্পনাটা প্রথমে আলীম ভাই-এর মাথায় এসেছিল। রাতারাতি একটা স্মৃতিস্তম্ভ গড়বো আমরা।

চমৎকার। শুনে সায় দিয়েছিলো সবাই।

মেডিকেল হোস্টেলের চারপাশে তখন জমাট নিস্তব্ধতা। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার চলাচল নেই। আকাশমুখী গাছগুলো কুয়াশার ভারে আনত। একে-একে ছেলেরা সবাই বেরিয়ে এলো ব্যারাক ছেড়ে।

প্রথমে একটা জায়গা ঠিক করে নিলো ওরা।

শহীদ রফিকের গুলিবিদ্ধ খুলিটা চরকির মতো ঘুরতে ঘুরতে যেখানে এসে ছিটকে পড়েছিল— ঠিক হলো সেখানে স্মৃতিস্তম্ভ গড়বে ওরা।

সেখানে প্রায় তিনশো গজ দূরে, মেডিকেল কলেজের একটা বাড়তি ঘর তোলার জন্যে ইট রাখা হয়েছিল স্তূপ করে। এই তিনশো গজ পথ সার বেঁধে দাঁড়ালো ছেলেরা। তারপর হাতে হাতে একঘন্টার মধ্যে চারহাজার ইট সেখান থেকে বয়ে নিয়ে এলো ওরা। স্টোররুমের তালা খুলে তিনবস্তা সিমেন্ট বের করা হলো। দুজন গিয়েছিল রাজমিস্ত্রি আনতে চকবাজারে। সেই শীতের রাতে অনেক তালাশ করে মিস্ত্রি নিয়ে ফিরে এলো ওরা।

সারারাত কাজ চললো।

পরদিন সমস্ত দেশ অবাক হয়ে শুনলো সে খবর।

তারপর।

তারও দিনচারেক পরে আরো একটা খবর শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ় হলো সবাই। সরকারের মিলিটারি এসে স্মৃতিস্তম্ভটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে গেছে।

কিন্তু ছেলেরা দমেনি। ধুলোয় মেশানো ইটের পাঁজাগুলোকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল ওরা। কয়েকটা গন্ধরাজ আর গাঁদাফুলের চারা লাগিয়ে দিয়েছিলো ভেতরে।

এসব তিনবছর আগের কথা।

সে-রাতে মেডিকেলের ছেলেরা কাপড় দিয়ে কঞ্চির ঘেরটা ঢেকে নিলো সযত্নে। বাগান থেকে ফুল তুলে এনে অজস্র ফুলে ভরিয়ে দিলো বেদি। তারপর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গান গাইলো ওরা— শহীদের খুন ভুলবো না। বরকতের খুন ভুলবো না।

কাগজ দিয়ে গড়া স্মৃতিস্তম্ভের কাজ শেষ হলে পরে ছেলেরা অনেকে কবি রসুলের রুমে বিশ্রাম নিতে এলো। রাহাত আর মাহের হাত পা না-ধুয়ে ধপ করে শুয়ে পড়লো বিছানার ওপর।

উহ্, এই শীতের ভেতরেও গায়ে ঘাম বেরিয়ে গেছে। রাহাত হাই তুললো। মাহের বললো, একটা সিগারেট খাওয়া না রসুল ভাই। আছে?

না, নেই। কম্বলের ভেতর থেকে মুখ বের করে জবাব দিলো রসুল। বিকেল থেকে শরীরটা জুরজুর করছিল ওর। এখন আরো বেড়েছে। কিন্তু সেটাও জানতে দেয়নি কাউকে। ওর ভয়, যদি জ্বরের খবরটা সবাই জেনে যায়, তাহলে ঘর ছেড়ে এক পাও বাইরে বেরুতে দেবে না ওকে। উহ্! এমন দিনেও কেউ ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে পারে।

নড়েচড়ে শুতে গিয়ে ওর গায়ে হাত লাগাতে রাহাত চমকে উঠলো। এ কী রসুল ভাই, তোমার জ্বর এসেছে?

এই সামান্য জ্বর।

ইস্। গা দেখছি পুড়ে যাচ্ছে, আর তুমি বলছো সামান্য। রাহাত উঠে বসে কম্বলটা ভালো করে জড়িয়ে দিল ওর।

মাহের বললো, আমি ঘুম দিলাম রাহাত। ভোররাতে, ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ তোলার সময় আমায় জাগিয়ে দিয়ো।

এখন আবার ঘুমোবে কী? রাহাত কোনো উত্তর দেবার আগে আরেকজন বললো। একটু পরেই পতাকা তোলার সময় হয়ে যাবে। তারচে এসো গল্প করি।

সেই ভালো। মাহের উঠে বসলো, কিন্তু একটু ধুঁয়ো না পেলে জমছে না। আছে নাকি কারো কাছে, থাকলে এক-আধটা দাও।

আহ্, তুমি জ্বালিয়ে মারলে। কে একজন বলে উঠলো, নাও, টানো।

সিগারেটটা ধরিয়ে একটা তৃপ্তির টান দিলো মাহের। তারপর একটা গল্প বলতে শুরু করলো সে।

ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রেখেছিলো সালমা। এলার্মের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ওর। গায়ের ওপর থেকে লেপটা সরিয়ে দিয়ে ধীরেধীরে উঠে বসলো। বাতিটা জ্বালিয়ে কলগোড়া থেকে হাতমুখ ধুয়ে এলো। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘন চুলগুলোর মধ্যে মৃদু চিরুনি বুলিয়ে নিলো সালমা। খাটের তলা থেকে স্টোভটা টেনে নিয়ে আগুন ধরালো। ঠাণ্ডায় হাত পা কাঁপছিল। আগুনের পাশে বসে গাটা একটু গরম করে নিলো সে। তারপর চায়ের কেতলিটা আগুনে তুলে দিয়ে আসাদকে ডাকতে গেল।

দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকতে বড় সংকোচ হচ্ছিল সালমার। দরজা খুলে দেখলো, কম্বলটাকে গায়ে জড়িয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে আসাদ। বালিশের ওপর থেকে মাথাটা গড়িয়ে পড়েছে বিছানার ওপর। চোখে তার গাঢ় ঘুম। কী নাম ধরে ওকে ডাকবে সালমা ভাবলো। আসাদ সাহেব, না আসাদ ভাই।

অবশেষে ডাকলো, এই শুনছেন। চারটা বেজে গেছে, শুনছেন?

শোনার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না।

আহ্, কী হচ্ছে এই রাতের বেলা। সহসা রেগে গেলো আসাদ। তার চোখেমুখে বিরক্তি। ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে শুলো সে।

সালমা মুখ টিপে হাসলো।

আচ্ছা বিপদ তো লোকটাকে নিয়ে! এই যে শুনছেন? কাঁধের পাশে জোরে একটা ধাক্কা দিলো সালমা।

ধড়ফড় করে এবার বসলো আসাদ। কী ব্যাপার ক'টা বাজে? চারটা। চারটা। সালমা ঈষৎ ঘাড় নেড়ে বললো, আপনি তো বেশ ঘুমোতে পারেন? উঠুন, চটপট হাতমুখ ধুয়ে নিন। আমি যাই। চায়ের পানিটা নামাই গিয়ে। কেমন? মিষ্টি করে হাসলো সালমা।

যান, আমি আসছি। আসাদের চোখেমুখে তখনো ঘুমের অবসাদ। জড়ানো গলায় সে বললো, উহ্, কী শীত! হাত-পা সব ঠকঠক করে কাঁপছে।

চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিন। নইলে ঠাণ্ডা লাগবে। যাবার সময় বলে গেলো সালমা।

ঘুমে তখনো চোখজোড়া বারবার জড়িয়ে আসতে চাইলো। তবু চাদরটা গায়ে টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো আসাদ। চটিজোড়া খাটের তলা থেকে বের করে নিয়ে পরলো।

বারান্দার বালতি-ভরা পানি ছিল।

পানিতে হাত দিয়ে ঠাণ্ডায় শিউরে উঠলো সে।

উত্তর থেকে ভেসে-আসা ঈষৎ ভেজা বাতাস দেয়ালের গায়ে প্রতিহত হয়ে অদ্ভুত একটা শব্দের সৃষ্টি করছে। সে শব্দঅনেকটা যেন হাহাকারের মতো শোনাচ্ছে কানে।

ও ঘর থেকে সালমা শুধালো, আপনার হাতমুখ ধোয়া হলো আসাদ সাহেব?

এই তো হলো।

ঘরের মধ্যে আর কোনো আলো নেই। অন্ধকারে শুধু স্টোভটা জ্বলছে, মাঝখানে তার পাশে বসে স্থিরচোখে কেতলিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সালমা। দেয়ালে বড় হয়ে একটা ছায়া পড়েছে তার। দোরগোড়ায় মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো আসাদ। হঠাৎ দেয়ালের ছায়াটাকে অদ্ভুত সুন্দর বলে মনে হলো ওর।

নিঃশব্দে স্টোভটার কাছে এসে বসলো আসাদ।

আপনার কি খুব শীত লাগছে? একসময় আস্তে করে সালমা শুধালো।

স্টোভের আরো একটু কাছে সরে এসে আসাদ বললো, সত্যি ভীষণ শীত পড়ছে। হাতজোড়া বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দেখুন। বলে হাত দুটো ওর দিকে এগিয়ে দিল আসাদ।

অন্ধকারে মৃদু হাসলো সালমা। হাত বাড়িয়ে ওর হাতের তাপ অনুভব করতে গেলে হাতজোড়া মুঠোর মধ্যে আলতো ধরে রাখলো আসাদ। সালমা শিউরে উঠলো।

প্রথমে রীতিমতো ঘাবড়ে গেল সে। ঈষৎ বিস্মিত হলো।

তারপর চুপচাপ মাথা নিচু করে তাকিয়ে রইলো জ্বলন্ত স্টোভের দিকে। বুকটা দুরদুর কাঁপছে তার। এই শীতের ভেতরেও মনে হলো সে যেন ঘামতে শুরু করেছে। কয়েকটি মুহূর্ত, বেশ ভালো লাগছে সালমার। সে ওর মুখের দিকে তাকাবার সাহস পেলো না। হাতজোড়া টেনে নেবার কোনো চেষ্টা করলো না। শুধু আধফোটা স্বরে বললো, পানি গরম হয়ে গেছে। বলতে গিয়ে গলাটা অদ্ভুতভাবে কেঁপে উঠলো। তারপর একসময় আস্তে হাতজোড়া টেনে নিলো সালমা।

নিঃশব্দে চা তৈরি করতে লাগলো সে।

চায়ের কাপে চামচের টুংটাং শব্দ।

আসাদ বললো, আমার কাপে চিনি একটু কম দেবেন।

সালমার মনে হলো, আসাদের গলাটাও যেন কাঁপছে। যেন একটু আড়ষ্ট আর জড়িয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বর।

অন্ধকারে বারকয়েক ওর শক্ত সবল হাতজোড়ার দিকে তাকালো সালমা। না। রওশন তার হারানো হাত দুটো আর কোনোদিন ফিরে পাবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস বাতাসে শিহরন জাগিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ নীরবে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল ওরা। মিছিল, শোভাযাত্রা, ধর্মঘট মুহূর্তের জন্য সবকিছু দূরে সরে গেল।

তারপর।

তারও অনেক পরে।

আগে থেকে রিকশা ঠিক করা ছিলো, দোরগোড়ায় তার ডাক শোনা গেলো। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আসাদ বললো, কাপড় পরে নিন, সময় হয়ে গেছে।

সালমা অস্ফুটস্বরে যে কী বললো, বোঝা গেল না।

বাইরে কনকনে শীত।

রিকশায় এসে চুপচাপ বসলো ওরা।

সালমাকে মেয়েদের হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে আসাদ তখন ছেলেদের ব্যারাকে এসে ঢুকলো। ঠিক সে-সময়ে হঠাৎ টাইফুনের শব্দে শ্লোগানের তরঙ্গ জেগে উঠলো চারদিকে। অন্ধকারের বুক চিরে ধ্বনির বজ্র ইথারে-ইথারে কাঁপন সৃষ্টি করলো।

মুসলিম হল, নূপুর ভিলা, চামেরী হাউস, ফজলুল হক হল, বান্ধব কুটির, মেডিকেল হোস্টেল, ঢাকা হল যেন হুঙ্কার দিয়ে উঠলো একসাথে। সে শব্দতরঙ্গে অভিভূত হয়ে কে একজন ব্যারাকের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললো, বিদ্রোহ চারিদিকে।

ছেলেরা তখন কালো পতাকা উত্তোলন করছিল।

সরু সিঁড়িটা বেয়ে ছাতের ওপর উঠে এলো একদল ছেলে। মুনিম জিজ্ঞেস করলো, মই এনেছো তো?

হ্যাঁ।

দেখো, মইটা খুব মজবুত নয়। সাবধানে উঠো। কালো পতাকাটা উড়িয়ে দাও।

পতাকাটা উড়িয়ে দেয়া হলে পর বেশ কিছুক্ষণ ধরে শ্লোগান দিলো ওরা। তারপর কেউ কেউ নিচে নেমে গেলো। আর কয়েকজন ছাতের ওপর পায়চারি করতে লাগলো নিঃশব্দে।

একপাশে, যেখানে কার্নিশটা বেশ চওড়া, সেখানে এসে বসলো মুনিম। কুয়াশা-ছাওয়া আকাশে তখন তারা নিভতে শুরু করেছে একটা-একটা করে। রমনার আকাশে ধলপহর দিচ্ছে। মৃদু উত্তরী বাতাসে শীতের শেষ সুর। দু-একটা পাখি শাল আর দেবদারু গাছের ফাঁকে কিচিরমিচির করে ডাকছে।

কার্নিশের ওপর থেকে দেখলো মুনিম। তিন লরী পুলিশ এসে নামলো মুসলিম হলের গেটে। সাথে একটা জিপ। জিপ থেকে নামলেন পুলিশ অফিসাররা। গাট্টাগোট্টা চেহারা। চোখগুলো লাল লাল।

গেটটা বন্ধ ছিলো বলে বাইরে দাঁড়াতে হলো ওদের। দারওয়ানকে ডাকলো কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ পেলো না। ফ্ল্যাগস্ট্যান্ডে কালো পতাকাটা পতপত করে উড়ছিলো। সেদিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষলো ওরা।

ছেলেরা তখন শ্লোগান দিতে শুরু করেছে— 'দমন নীতি চলবে না।'

ছাতের ওপর থেকে দ্রুত নিচে নেমে এলো মুনিম।

একটা ছেলে ওকে দেখতে পেয়ে বললো, আপনি ওদিকে যাবেন না মুনিম ভাই। আপনি পেছনে থাকুন।

আরেকটি ছেলে হাত ধরে পেছনের দিকে টেনে নিয়ে গেলো তাকে। খবর পেয়ে ইতিমধ্যে প্রভোস্ট সাহেব এসে হাজির। মোটাসোটা দেহটা নিয়ে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠেছিলেন তিনি, বুকটা দুরদুর করছিল। শুকনো ঠোঁটজোড়া নেড়ে বারবার বিড়বিড় করছিলেন তিনি, কী আপদ।

তাঁকে দেখে দারওয়ান সালাম ঠুকে গেট খুলে দিলো। গেট খুলতে পুলিশ অফিসাররা হুড়মুড় করে ঢুকতে যাচ্ছিল, ছেলেরা চিৎকার করে উঠলো, আপনারা ভেতরে ঢুকবেন না বলছি।

আহাহা, কী হয়েছে, কী হয়েছে। হাত নেড়ে একবার পুলিশ অফিসারদের দিকে, আরেকবার ছাত্রদের দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে তার। দেহটা কাঁপছে।

ছেলেরা বললো, ওদের বাইরে দাঁড়াতে বলুন। স্যার, ভেতরে এলে ভালো হবে না।

আহাহা, আপনারা ভেতরে আসছেন কেন, বাইরে দাঁড়ান একটু। প্রভোস্ট সাহেবের কথায় অপ্রস্তুত হয়ে গেটের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো পুলিশ অফিসাররা।

ছেলেদের সঙ্গে এরপর কিছুক্ষণ বচসা হলো প্রভোস্ট সাহেবের। প্রভোস্ট সাহেব বললেন, কী আপদ, কালো পতাকাটা এবার নামিয়ে ফেললেই তো পারো তোমরা। নামিয়ে ফেলো না কেন।

বাজে অনুরোধ আমাদের করবেন না স্যার। নামাবার জন্যে ওটা তুলিনি। ছেলেরা একস্বরে বলে উঠলো।

নিরাশ হয়ে বারকয়েক মাথা চুলকালেন প্রভোস্ট সাহেব। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, কী আপদ, কী আপদ।

পুলিশ অফিসারগুলোর ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিলো। তাই হুড়মুড় করে আরেক প্রস্থ ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলো তারা। ছেলেরা এগিয়ে এসে বাধা দিলো। আমরা ঢুকতে দেবো না বলছি, দেবো না।

তবু খাকিপোশাক-পরা অফিসারদের সামনে এগুতে দেখে পরক্ষণে অপরিসর বারান্দার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো ওরা। তারপর চিৎকার করে বললো, যেতে হলে বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যাও, এমনি যেতে দেবো না আমরা।

পুলিশ অফিসারগুলো পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। একজন অফিসার আরেকজনের কানে ফিসফিসিয়ে বললো, আমাদের অত কোমল হলে চলবে কেন স্যার, শুনলে কিউ সাহেব বরখাস্ত করে দেবেন আমাদের। কিন্তু কেউ সাহস করলো না এগুতে।

মেডিকেলে মেয়েদের হোস্টেলের বাঁ-দিকটার রুমটায় তিন-চারজন মেয়েকে নিয়ে বসে আলাপ করছিল সালমা। বাইরে বারান্দায় বসে তখন কয়েকটি মেয়ে গান গাইছিল— ওদের ভুলতে পারি না, ভুলি নাই রে—। একটু আগে কালো পতাকা তুলেছে ওরা। এখনো সেই পতাকা তোলার বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলো। এমন সময়, হঠাৎ একটা বিরাট শব্দে চমকে উঠলো সালমা। বারান্দা থেকে একটি মেয়ে চিৎকার করে বললো, পুলিশ।

কোথায় ? সালমা ছিটকে বেরিয়ে এলো বারান্দায়।

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দেখালে, ওই দ্যাখো।

সালমা চেয়ে দেখলো পুলিশ বটে। ছাত্রদের ব্যারাক ঘেরাও করেছে ওরা। সামনে দাঁড়িয়ে কিউ খান নিজে। রাতে বড়কর্তার পাল্লায় পড়ে মাত্রাতিরিক্ত টেনেছে। তার আমেজ এখনো যায়নি। মাথাটা উসখুস লাগছে। চোখজোড়া জবাফুলের মতো লাল টকটকে।

মেডিকেল ব্যারাকের গেটটা পেরুতে কাপড়-দিয়ে-ঘেরা শহীদবেদিটা চোখে পড়লো খানের। লালচোখে আগুন ঠিকরে বেরুলো তার। আধো আলো-অন্ধকারে শহীদ-বেদিটার দিকে তাকালে গা'টা কেমন ছমছম করে ওঠে। আলকাতরার মতো কালো কাপড়টা অন্ধকারে যেন বিভীষিকাময় করে তুলছে। আর তার ওপর যত্নে সাজিয়ে-রাখা অসংখ্য ফুলের মালা হিংস্র পশুর চোখের মতো জ্বলছে ধিকিধিকি করে।

কিউ খানের ঈশারা পেয়ে একদল পুলিশ অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো শহীদবেদিটার উপর। কব্জির ঘেরাটা দুহাতে উপড়ে অদূরে নর্দমার দিকে ছুড়ে মারতে লাগলো তারা। কালো কাপড়টা টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলো একপাশে। ফুলগুলো পিষে ফেললো বুটের তলায়। হঠাৎ একটা রক্তগোলাপ মাড়াতে গিয়ে কিউ খানের মনে পড়লো, যৌবনে একটি মেয়েকে এমনি একটি ফুল দিয়ে প্রেম নিবেদন করেছিলো সে। একমুহূর্ত নীরব

থেকে পিশাচের মতো হেসে উঠলো কিউ খান। হৃদয়ের কোমলতা তার মরে গেছে বহুদিন আগে।

ছেলেরা ইতিমধ্যে ব্যারাক ছেড়ে বেরিয়ে জমায়েত হয়েছে বাইরে। আর মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে শ্লোগান দিচ্ছে উত্তেজিত গলায়। কারো গায়ে গেঞ্জি, কারো লুঙ্গি ছাড়া আর কিছু নেই পরনে। কেউকেউ গায়ে কম্বল চাপিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বাইরে। সকলে উত্তেজিত। ক্রোধ আর ঘৃণায় হাত-পাগুলো কাঁপছিলো। যেন পুলিশগুলোকে হাতের মুঠোয় পেলে এক্ষুনি পিষে ফেলবে ওরা।

হঠাৎ কিউ খানের বন্য গলায় আওয়াজ শোনা গেল— 'চার্জ'।

মুহূর্তে পুলিশগুলো ঝাঁপিয়ে পড়লো ছাত্রদের ওপর।

ওসমান খান সীমান্তের ছেলে। ভয় কাকে বলে জানে না সে। ছাত্রদের বেপরোয়া মারতে দেখে সে আর স্থির থাকতে পারলো না। বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো পুলিশের মাঝখানে। ইয়ে সব ক্যয়া হোতা হ্যায়, হামলোগ ইনসান নাহি হ্যায় ? দুজন পুলিশকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো ওসমান খান। ছেলেরা সব পালাচ্ছিলো। ওসমান খান চিৎকার করে ডাকলো ওদের, আরে ভাগতা হ্যায় কিউ। ক্যয়া, হামলোগ ইনসান নাহি হ্যায় ? কিন্তু পরক্ষণে একজন লালমুখো ইন্সপেক্টর ছুটে এসে গলাটা টিপে ধরলো তার। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে কয়েকটা ঘুসি বসিয়ে দিল ওসমান খানের মুখের ওপর। প্রথম কয়েকটা ঘুসি কোনোরকমে সয়ে নিয়েছিলো সে। তারপর হুঁশ হারিয়ে টলে পড়লো মাটিতে।

রশীদ চৌধুরী এতক্ষণ লেপের তলায় ঘুমোচ্ছিলো। এসব হট্টগোল আর শ্লোগান দেয়া ওর ভালো লাগে না। যারা এসব করে তাদের দু-চোখে দেখতে পারে না সে। ও জানে শুধু দুটো কাজ। এক হলো সিনেমা দেখা, আর দুই হলো সারারাত জেগে ফ্লাশ খেলা। এ দুটো নিয়ে মশগুল থাকে সে। বাইরে হট্টগোল শুনে ব্যাপার কী দেখার জন্যে দরজা দিয়ে উঁকি মারছিলো সে। অমনি একটা পুলিশ হাতের ব্যাটান দিয়ে গুঁতো মারলো ওর মুখের ওপর। অস্পষ্ট আর্তনাদ করে দরজাটা বন্ধ করে দিতে চাইছিলো রশীদ চৌধুরী। ধাক্কা মেরে দরজাটা খুলেই পুলিশটা ওর গেঞ্জি চেপে ধরলো। ভাগতে হে কাহা চালিয়ে।

রশীদ চৌধুরী বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে লাগলো, আমি কিছু করিনি।

আরে-আরে এ কী হচ্ছে ? খামোশ। ভয়ঙ্কর স্বরে হুংকার দিয়ে উঠলো পুলিশটা।

রশীদ চৌধুরী আবার তাকে বোঝাতে চাইলো যে, সে নির্দোষ। আমি কিছু করিনি, কসম খোদার বলছি। কিন্তু ওতে কোনো ফল লাভ ঘটলো না দেখে এবার রীতিমতো গরম হয়ে উঠলো রশীদ চৌধুরী। চিৎকার করে সে তার বন্ধুদের ডাকলো। ভাইসব—। তারপর শ্লোগান দিতে লাগলো উত্তেজিত গলায়।

॥ আট ॥

ভোরে আসার কথা ছিলো। আসতে বললেই হয়ে গেলো ওর। ছাইদানের ওপর রাখা সিগারেট থেকে শীর্ণ ধোঁয়ার রেখা সাপের মতো এঁকেবেঁকে উঠে বাতাসে মিইয়ে যাচ্ছে। বিছানা শূন্য। কৌচেও কেউ বসে নেই। বাথরুমে ঝপঝপ শব্দ হচ্ছে পানি পড়ার। বজলে চারপাশে তাকিয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটি ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে ছবি দেখতে

লাগলো। কিছুক্ষণ পর পানি পড়ার শব্দ বন্ধ হলে, তোয়ালে দিয়ে মাথার পানি মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো মাহমুদ। এই যে, তুমি এসে গেছো তাহলে। ও হেসে বললো, ওই পত্রিকার নিচে সিগারেটের প্যাকেট আছে, নিয়ে একটা ধরাও।

বজলে শুধালো, সাহানাকে দেখছি না, ও কোথায় গেলো?

চুলে তেল মাখছিলো মাহমুদ, মুখ না-ঘুরিয়েই বললো, আর বোলো না, ওর সঙ্গে কাল রাতে একটা বিশ্রীরকমের ঝগড়া হয়ে গেছে আমার।

হঠাৎ?

না ঠিক হঠাৎ নয়। ক'দিন থেকে সম্পর্কটা বড় ভালো যাচ্ছিল না। ক্ষণিক বিরতি নিয়ে মাহমুদ আবার বললো, তুমিতো জানো, ওর ব্যাপারে কোনোদিন কোনো কার্পণ্য করিনি আমি। যখন যা চেয়েছে দিয়েছি, কিন্তু, কী জানো মেয়েটা একনম্বরের নিমকহারাম, বড় নির্লজ্জ আর—ওসব কথা শুনে তোমার কাজ নেই। থেমে আবার নতুন কিছু বলতে যাচ্ছিল মাহমুদ। বজলে বাধা দিয়ে বললো, কিন্তু সে গেলো কোথায়?

মাহমুদ ক্ষণকাল চুপ থেকে বললো, চলে গেছে, ভোরে উঠে ওর মালপত্র নিয়ে—বুঝলে বজলে, একটা কথা না বলে চলে গেছে। যাক, মরুকগে আমার কী? চুলের ওপর চিরুনি বুলোতে বুলোতে মুখটা বিশ্রীভাবে বাঁকালো মাহমুদ।

সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে ম্যাগাজিনের ওপর আবার চোখ নামালো সে। হ্যাঁ, যে-কথা বলার জন্যে তোমাকে ডেকেছিলাম বজলে—।

হুঁ, বলো। পত্রিকাটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো সে।

দেয়ালে টাঙানো ওর নিজের ছবিটার দিকে তাকিয়ে মাহমুদ মৃদু গলায় বললো, মুনিম তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই না?

এ-ধরনের প্রশ্ন আশা করেনি বজলে। তাই প্রথমে সে কিছুক্ষণের জন্যে বোবা হয়ে গেলো। তারপর আস্তে করে বললো, না, ঠিক ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়, তবে তার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের আলাপ। কিন্তু কেন বলো তো?

না, এমনি। থেমে আবার বললো মাহমুদ। ওর সম্পর্কে তোমার ধারণাটা কী বলো তো, মানে ছেলেটা কেমন?

সিগারেটে একটা টান দিলো বজলে। তারপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, দ্যাখো, ব্যক্তি হিসেবে ওকে বেশ ভালোই লাগে আমার। তবে ওর রাজনৈতিক আদর্শকে আমি ঘৃণা করি। কিন্তু আজ হঠাৎ এসব প্রশ্ন কেন করছো আমায়?

মাহমুদ সহসা কোনো জবাব দিল না। তারপর যখন সবকিছু খুলে বললো, তখন আর কিছু অস্পষ্ট রইলো না বজলের কাছে। বজলের উচিত মুনিমের সঙ্গে খুব সদভাব রাখা। ওর আস্থাভাজন হওয়া। তারপর ধীরেধীরে ওর কাছ থেকে ভেতরের খবরগুলো সব অতি-সাবধানে বের করে নেয়া। কোথায় থাকে সে, কী করে, কাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, এসব জেনে মাহমুদকে বলা। এর বিনিময়ে তার কর্তাদের কাছ থেকে ওকে একটা মোটা টাকার বন্দোবস্ত করে দিতে পারে মাহমুদ। কোনো খাটুনি নেই অথচ ফিঁয়াসেকে নিয়ে আমোদ-স্ফুর্তিতে থাকার মতো অনেক টাকা পাবে সে।

অর্থাৎ তুমি আমাকে গোয়ান্দাগিরি করতে বলছো, তাই না? অল্প একটু হেসে গম্ভীর হয়ে গেলো বজলে।

না, ঠিক তা নয়। বুঝলে বজলে, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। মাহমুদ ইতস্তত করছিলো—

প্যাকেট থেকে আরেকটা সিগারেট বের করে নিয়ে বজলে ধীরেধীরে কেটে-কেটে বললো, দেখো মাহমুদ, তুমি তো আমাকে জানো, জীবন সম্পর্কে আমার নিজস্ব একটা দর্শন আছে—সেটা হলো কারো ক্ষতি না-করা, কাউকে দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত না-হওয়া। ঝামেলা আমার ভালো লাগে না। আমি চাই নিরুপদ্রব অথচ সুন্দর জীবন। আমাকে ওসব জটিলতার ভেতর না টানলে কি ভালো হয় না?

একটু আগের হালকা আবহাওয়াটা হঠাৎ যেন একটু গুমোট বলে মনে হলো মাহমুদের। উভয়ে খানিকক্ষণের জন্যে মৌন হয়ে রইলো। অবশেষে মৌন ভেঙে বজলে বললো, তুমি কি এখন বেরুবে কোথাও?

দেয়ালে একটি টিকটিকি খাবারের তালাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেদিকে চেয়ে থেকে মাহমুদ বললো, না, এ বেলা কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই, ঘরেই থাকবো।

একটু পরে বজলে উঠে দাঁড়ালো। দুপুরের দিকে ভলি হয়তো আসতে পারে এখানে। এলে বসতে বলো, আমি আবার আসবো—বলে আর অপেক্ষা করলো না।

ও চলে গেলে কিছুক্ষণ চোখ মুদে চুপচাপ বসে রইলো মাহমুদ। হাতঘড়িটা দেখলো বারকয়েক। ন'টা বাজতে মিনিট কয়েক বাকি। এতক্ষণে তার এসে যাবার কথা। মাহমুদ বিড়বিড় করে বললো, এখনো এলো না যে? উঠে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করলো সে। জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যেতে শিকারি কুকুরের মতো কানজোড়া খাড়া হয়ে গেল তার। হ্যাঁ, তারই পায়ের শব্দ। মুখখানা প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেল। একটু পরে পর্দার ফাঁক দিয়ে তার চেহারা দেখা গেলো। মাহমুদ মৃদু হেসে ডাকলো, এসো।

চারপাশে একপলক তাকিয়ে নিয়ে ভেতরে এসে কৌচের উপরে বসলো সবুর।

মাহমুদ উৎকণ্ঠা নিয়ে বললো, এত দেরি হলো যে?

সবুর একটা ক্লান্তির হাই তুলে বললো, কয়েকটা ছেলে এ্যারেস্ট হয়েছে। ওদের নিয়ে ছেলেদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে কিনা তাই আসতে দেরি হয়ে গেল। বলে আরেকবার চারপাশে তাকালো সে।

মাহমুদ সিগারেটের প্যাকেটটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, তারপর কী খবর বলো।

সবুর মৃদু হেসে বললো, গতকাল এ রিপোর্টটা পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছেন তো? মাহমুদ মাথাটা সামনে একটু ঝুঁকিয়ে বললো, হ্যাঁ পেয়েছি। সবুর বললো, আমাকে এখুনি আবার ফিরে যেতে হবে হলে। আজকের রিপোর্টটা বিকেলে পাঠিয়ে দেবো। আমাকে ডেকেছিলেন কেন বলুন তো

হ্যাঁ তোমাকে ডেকেছিলাম— হ্যাঁ, শোনো একটু সাবধানে থেকো আর তোমার রিপোর্টগুলো খুব ভাসাভাসা হয়ে যাচ্ছে, আরো একটু বেশি করে ইনফরমেশন দেবার চেষ্টা করো।

সবুর আহত হলো। কেন, ইনফরমেশন কি আমি কম দিই।

না না, সে কথা আমি বলছিনে। শব্দ করে হেসে পরিবেশটা হালকা করে দিতে চাইলো মাহমুদ। বললো, আরো ইনফরমেশন থাকা দরকার। আমি সে কথা বলছিলাম।

আচ্ছা ভবিষ্যতে তাই চেষ্টা করবো। সবুর উঠে দাঁড়ালো। দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে এলো সে।

মাহমুদ জিজ্ঞাসু-চোখে তাকিয়ে বললো, কী ?

সবুর বললো, আমার এ-মাসের বিলটা এখনো পাইনি।

ও হ্যাঁ, তোমার বিল তৈরি হয়ে আছে, দু-একদিনের মধ্যে পেয়ে যাবে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে টেবিলের ওপর রাখা ম্যাগাজিনটার পাতা ওলটাতে লাগলো মাহমুদ। সবুরের পায়ের শব্দটা একটু পরে ধীরেধীরে মিলিয়ে গেলো সিঁড়ির ওপর।

বেলা নটা-দশটা থেকে ছেলেরা বিভিন্ন হল, কলেজ আর স্কুল থেকে এসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমায়েত হতে লাগলো। রাস্তা দিয়ে দলবদ্ধভাবে না এসে, একজন-দুজন করে আসছিল ওরা। কারণ শহরে তখনো একশো চুয়াল্লিশ ধারা পুরোপুরিভাবে বহাল রয়েছে। জিপে চড়ে পুলিশ অফিসাররা ইতস্তত ছুটোছুটি করছে রাস্তায়। কয়েকটি রাস্তার মোড়ে স্টেনগান আর ব্রেনগান নিয়ে রীতিমতো ঘাঁটি পেতে বসেছে ওরা।

শহরের চারপাশ থেকে ছেলেরা যেমন আসছিলো, তেমনি সাথে করে নতুন নতুন খবর নিয়ে আসছিলো ওরা। একদল ছেলে নিজেদের মধ্যে কী যেন আলোচনা করতে করতে মধুর স্টলে এসে ঢুকলো। আসাদ কাছেই বসেছিলো ওদের। ঘাড় বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কোথেকে এসেছেন ?

আমরা নবকুমার হাই স্কুল থেকে।

আর আপনারা ?

আমরা জগন্নাথ কলেজ।

ওদিককার খবর কি ?

সাতজনকে এ্যারেস্ট করেছে।

আরে, ডা. জামান যে, তোমাদের হোস্টেলে নাকি পুলিশের হামলা হয়েছিলো। ব্যাপার কী ?

তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মোট সতেরোজন গ্রেফতার, তার মধ্যে সাতজন মেয়ে।

ওর কথায় চমকে উঠলো আসাদ। সালমার কথা মনে পড়লো। ক্ষণিক নীরব থেকে আগ্রহের সাথে সে প্রশ্ন করলো, মেয়েদের হোস্টেলেও হামলা হয়েছিল বুঝি।

হয়েছিলো মানে ? রীতিমতো কুরুক্ষেত্র ! জামান হেসে জবাব দিল। মেয়েরা অবশ্য একহাত দেখিয়েছে এবার। সেই পঞ্চাশ সালের কথা মনে নেই ? তখন স্ট্রাইকের সময় আমরা দোরগোড়ায় শুয়ে পড়েছিলাম আর মেয়েরা আমাদের গায়ের ওপর দিয়ে টপকে ক্লাশে গিয়েছিলো। সেই পাজি মেয়েগুলো এখন আর নেই। ওগুলো প্রায় সব বেরিয়ে গেছে। এখন নতুন যারা এসেছে তারা বেশ ভালো। জামান থামলো।

আসাদ ভাবছিল সালমা গ্রেফতার হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু কী ভেবে প্রশ্নটা করলো না সে।

পাশের টেবিলে তখন খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো আরেক দল ছেলে।

একজন ডাকলো, বলাই এদিকে এসো। এদিকে দুকাপ চা দাও মধুদা।

খাবার আছে কিছু ? যা আছে নিয়ে এসো, ভালো করে খেয়েনি। যদি এ্যারেস্ট হয়ে যাই তো খিদেয় মরবো।

কী ব্যাপার, একটা সন্দেশ চেয়ে-চেয়ে হয়রান হয়ে গেলাম, এখনি কালো পতাকা তুলতে যেতে হবে। কইরে বলাই, একটা সন্দেশ কি দিবি জলদি করে ? ব্যাটা অপদার্থ, তাড়াতাড়ি কর।

মুনিমকে এদিকে আসতে দেখে আসাদ উঠে দাঁড়ালো। মুনিমের হাতে দুটো কালো পতাকা আর একবান্ডিল কালো ব্যাজ। বান্ডিলটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে মুনিম বললো, আর দেরি করে কী লাভ। ছেলেরা প্রায় সব এসে গেছে। এখন কালো পতাকাটা তুলে দিই, কী বলো আসাদ।

আসাদ কোনো জবাব দেবার আগেই বাইরে থেকে কে একজন চিৎকার করে ডাকলো, মুনিম ভাই, আসুন আর কত দেরি।

পাশ থেকে রাহাত বললো, দাঁড়ান মুনিম ভাই, একটু দাঁড়ান। এককাপ চা খেয়েনি।

সবুর দাঁড়িয়েছিলো একটু দূরে। ওর কথা শুনে সে জ্বলে উঠলো ভীষণভাবে, তোমাদের শুধু খাওয়া কথা খাওয়া। কেন, একদিন না-খেলে কি চলে না ?

তোমার চলতে পারে, আমার চলে না। রাহাত রেগে উঠলো।

মুনিম বললো, হয়েছে তোমরা এখন ঝগড়া বাঁধিয়ো না, কালো পতাকা তুলতে কারা কারা যাবে এসো আমার সঙ্গে।

কয়েকজন ছেলেকে সাথে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের সিঁড়ি বেয়ে একটু পরে উপরে উঠে গেল মুনিম।

নিচে, সবুর স্টলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সংঘবদ্ধ হলো বাকি ছেলেরা, সংখ্যায় হয়তো শ' চার-পাঁচেক হবে ওরা। বয়সের তারতম্যটা সহজে চোখে পড়ে। কারো বয়েস ষোলো- সতেরোর বেশি হবে না। কারো চব্বিশ পেরিয়ে গেছে। কারো গায়ের রঙ কালো। কারো গৌরবর্ণ। কারো পরনে পায়জামা, কারো প্যান্ট। কিন্তু সংকল্পে সকলে এক। একটু পরে মুনিম আর তার সাথীদের ছাতের উপর দেখা গেল। ওরা কালো পতাকা তুলছে। পুবালি সূর্যের সোনালি আভায় চিকচিক করছে ওদের চোখমুখ। কালো পতাকা উড়ছে আর শ্লোগানের শব্দে ফেটে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ।

সার বেঁধে কয়েকটা পুলিশের গাড়ি এসে থামলো অদূরে, বিশ্ববিদ্যালয় গেটের সামনে। গাছের ছায়ায়। রাহাত মুখে মুখে গুণলো— এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত। সাত গাড়ি পুলিশ এসেছে রে, ওই দেখ দেখ, সাত গাড়ি পুলিশ এসেছে।

সবুর ঠোঁট বাঁকালো। এতেই ঘাবড়ে গেলে বুঝি ? সব পিঁপড়ে, একেবারে কাপুরুষের দল। এর চাইতে মায়ের কোলে বসে চুকচুক দুধ খাওয়া উচিত ছিলো তোমাদের।

খবরদার, মুখ সামলে কথা বলো বলছি, নইলে—। রাহাত ঘুসি বাগিয়ে উঠেছিলো, দৌড়ে এসে ওর হাতটা চেপে ধরলো আসাদ। একি হচ্ছে, এ কী করছো তোমরা। ছি-ছি। ঘৃণায় দেহটা রি-রি করে উঠলো তার। ওদের দিকে কিছু কালো ব্যাজ আর আলপিন এগিয়ে দিয়ে বললো, নাও, কালো ব্যাজ পরাও সকলকে, তোমরাও পরো।

ছেলেরা তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ইতস্তত দল বেঁধে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত। কেউ আলোচনা করছে পুলিশ নিয়ে। কেউ ভাবছে, যারা জেলে গেছে তাদের কথা।

কয়েকটি ছেলে ঘুরেঘুরে কালো ব্যাজ পরাচ্ছিল। কারো শার্টের পকেটে, কারো কাঁধের ওপর। আসাদ এগিয়ে গেলো তাদের দিকে। আপনারা অমন ঘুরঘুর করছেন

কেন ? সবাই একজায়গায় জমায়েত হোন, ওদের ডাকুন। তারপর সে নিজেই ডাক দিল, ভাইসব—। তার ডাকে ছেলেরা এসে ধীরেধীরে সংঘবদ্ধ হতে লাগলো আমগাছ তলায়।

মেয়েরাও এসে পৌঁছেছে এতক্ষণে। বারোজন মেয়ে। পরনে সবার কলো-পাড় দেয়া সাদা শাড়ি। চোখেমুখে সবার আনন্দের উজ্জ্বল দীপ্তি।

রাহাত বললো, আপনাদের আর সবাই কোথায় ?

নীলা বললো, ওরা আসবে না।

কেন ?

ওদের ভয় করে। আমগাছতলায় ছেলেদের পাশে ওর সাথীদের বসিয়ে রেখে নীলা সোজা মুনিমের কাছে এলো। কই ব্যাজ দিন, আমরা এখনো ব্যাজ পাইনি।

আমার কাছে তো নেই, আসাদের কাছে। হাত দিয়ে অদূরে দাঁড়ানো আসাদকে দেখিয়ে দিলো সে।

পুলিশ অফিসাররা তখন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে প্রক্টোরের সঙ্গে কী যেন আলাপ করছিলো অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে।

ছেলেরা ওদের দিকে তাকিয়ে আলাপ করছিলো।

তুমি কি মনে করো, পুলিশেরা ভেতরে আসবে ?

আসবে মানে, দেখছো না ওরা ভেতরে আসার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে ?

হলেই হলো নাকি, আমরা ওদের ভেতরে আসতে দেবো না।

আমরা এখানে শুয়ে পড়বো, তবু ঢুকতে দেবো না ওদের।

আমরা এখানে জান দিয়ে দেবো, তবু—

আহ, আপনারা থামুন, এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন, একটু চুপ করুন। মুনিমের গলা শোনা গেলো একটু পরে। কিন্তু শোরগোল থামানো গেলো না। কে একজন চিৎকার করে উঠলো— ওই যে, আরো দু'লরী পুলিশ আসছে, দেখো দেখো।

দু'লরী নয়, তিন লরী। তাকে শুধরে দিল আরেকজন। দেখলো মাথায় লোহার টুপি লাগিয়েছে ওরা, যেন যুদ্ধ করতে এসেছে।

প্রক্টোর সাহেবকে সাথে নিয়ে তিনজন পুলিশ-অফিসার লনটা পেরিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলো ছেলেদের দিকে। ইন্সপেক্টর রশীদের বুকটা কাঁপছিলো ভয়ে। কে জানে, ছাত্রদের ব্যাপার, কিছু বলা যায় না। কাছে গেলে কেউ যদি একটা ইট ছুড়ে মারে মাথার ওপর, তাহলে ? উহু, কেন যে এই পুলিশ-লাইনে এসেছিলাম। অস্পষ্ট গলায় বিড়বিড় করে ওঠে ইন্সপেক্টর রশীদ।

পাশ থেকে কিউ খান জিজ্ঞেস করেন, কী বললেন ?

বড় সাহেবের প্রশ্নে রীতিমতো অপ্রস্তুত হয়ে যায় ইন্সপেক্টর রশীদ। সামলে নিয়ে বলে, না না, ও কিছু না স্যার। বলছিলাম কী, এই ছেলেগুলো বড় বেশি বেড়ে গেছে, এদের আচ্ছা করে ঠ্যাঙানো উচিত।

হুম, ঠোঁটের ওপর মৃদু হাসি খেলে গেলো কিউ খানের।

ওদের দিকে এগুতে দেখে ছেলেরা এমন বিকটভাবে চিৎকার জুড়ে দিলো যে, কে কী বলছিলো ঠিক বোঝা গেলো না। আসাদ এগিয়ে এসে থামাতে চেষ্টা করলো ওদের। কিন্তু কেউ থামলো না।

ইন্সপেক্টর রশীদ বারকয়েক ইতস্তত করে বললো, আমাদের কথাটা আপনারা একটু শুনবেন কি ?

আপনাদের কথা আমরা শুনতে চাই না।

আপনারা এখান থেকে চলে যান।

এটা কি পুলিশ–ব্যারাক নাকি ?

এটা বিশ্ববিদ্যালয়।

এখানে কে ঢুকতে দিয়েছে আপনাদের ?

বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান এখান থেকে।

রেগে চোখমুখ লাল হয়ে গেল কিউ খানের। বারকয়েক দাঁতে দাঁত ঘষলেন তিনি। তারপর ইশারায় সাথীদের ফিরে আসতে বলে, নিজেও ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন। কপালে তার ভাবনার ঘন রেখা। কী করা যেতে পারে এখন ?

এদিকে ছেলেরা তখন উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে।

ওদের কিছুতেই এদিকে আসতে দেবো না আমরা।

না মুনিম ভাই, আপনি না বললে কী হবে। আমরা ওদের বাধা দেবোই।

ইট মেরে ওদের মাথা ফাটিয়ে দেবো আমরা। সবার গলা ছাপিয়ে সবুরের গলা শোনা গেলো, ভাইসব তোমরা ইট জোগাড় করো। আমরা জান দেবো তবু মাথা নোয়াবো না। আমরা বীরের মতো লড়বো, ইট জোগাড় করো—। ওর কথাটা শেষ না–হতে কে একজন চিৎকার করে উঠলো, পুলিশ। আরেকজন বললো, পালাও পালাও।

অদূরে, শ'খানেক পুলিশ অর্ধবৃত্তাকারে ছুটে আসছে ছাত্রদের দিকে। মাথায় ওদের হেলমেট, হাতে একটা করে লাঠি। লোহার নাল–লাগানো বুটজুতো দিয়ে শ্যামল দুর্বাঘাসগুলো মাড়িয়ে ছুটে আসছিলো ওরা। ছুটে আসছিলো দু–চোখে বন্য হিংস্রতা নিয়ে। পালাও, পালাও পুলিশ।

এর মাঝে আরেকটি কণ্ঠ শোনা গেলো— ভাইসব, পালিয়ো না রুখে দাঁড়াও। সে কণ্ঠস্বর আসাদের। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেলো চারিদিকের উন্মত্ত কোলাহলে।

ভাইসব পালিয়ো না। সমস্ত গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো আসাদ। সামনে তাকিয়ে দেখলো পুলিশগুলো প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়েছে তার। পেছনে একটা ছেলেও দাঁড়িয়ে নেই, সকলে পালাচ্ছে। শুধু পাঁচটি মেয়ে ভয়ার্ত চোখ মেলে বসে আছে ওর পেছনে–আমগাছতলায়। ভাইসব—। শেষবারের মতো ডাকতে চেষ্টা করলো আসাদ। পরক্ষণে একটা লাঠি এসে পড়লো ওর কোমরের ওপর। আর একটা। আরো একটা আঘাত।

টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল আসাদ। পাশ থেকে কে যেন গম্ভীর গলায় বললো, এ্যারেস্ট হিম। আর সঙ্গেসঙ্গে দুজন কনেস্টবল তাদের ইস্পাতদৃঢ় বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করলো তাকে।

আসাদের মনে পড়লো— বায়ান্ন সালের একটি দিনে প্রথম যে–দশজন ছেলে চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করেছিল, তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলো সে।

সেদিনও সবার আগে গ্রেফতার করা হয়েছিলো তাকে।

আর আজ তিনবছর পর সেই দিনটিতে সে আবার সবার আগে বন্দি হলো। বাণিজ্য–ভবনের দিকে যারা পালাচ্ছিল, তাদের মধ্যে মেয়েও ছিলো একজন। শাড়িতে পা জড়িয়ে

কংক্রিটের রাস্তায় ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো মেয়েটা। জীবনে কোনোদিন পুলিশের মুখোমুখি হয়নি, তাই ভয়ে মুখখানা সাদা হয়ে গেল তার। কলজেটা ধুকধুক করতে লাগলো গলার কাছে এসে। মনে মনে সে খোদাকে ডাকলো। খোদা বাঁচাও। পরক্ষণে চেয়ে দেখলো একটা কনেস্টবল। লাঠি উঁচিয়ে ছুটে আসছে ওর দিকে। অস্ফুট আর্তনাদ করে মেয়েটা চোখজোড়া বন্ধ করলো।

পুলিশভ্যানে উঠে দাঁড়াতে আসাদ পেছনে তাকিয়ে দেখলো, আমগাছতলায় বসে-থাকা সেই পাঁচটি মেয়েকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হচ্ছে এদিকে। নীলা আছে, রানু আর রোকেয়াও আছে ওদের দলে।

ওরা হাত তুলে অভিবাদন জানালো ওকে। তারপর এগিয়ে গেলো আরেকটা পুলিশ-ভ্যানের দিকে। ওদের দিক থেকে চোখজোড়া সরিয়ে আনতে আসাদ চমকে উঠলো, রাহাতও গ্রেফতার হয়েছে। কপাল চুঁইয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে ওর। সাদা জামাটা ভিজে লাল হয়ে গেছে রক্তে। কাছে আসতে দু-হাতে ওকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিলো আসাদ। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে ওর ক্ষতস্থানটা চেপে ধরলো সে। মেয়েরা তখন পাশের ভ্যান থেকে শ্লোগান দিচ্ছিল, বরকতের খুন ভুলবো না। শহীদের খুন ভুলবো না।

আরো জনকয়েক ছেলেকে এনে তোলা হলো প্রিজন-ভ্যানের ভেতর। তাদের মধ্যে একজনের কাঁধের উপর লাঠির ঘা পড়ায় হাড়টা ভেঙে গিয়েছে। তাই ব্যথায় সে কাতরাচ্ছিল আর ফিসফিস করে বলছিলো, হাতটা আমার ভেঙে গিয়েছে একেবারে, মাগো, ব্যথায় যে মরে গেলাম। কী, তোমরা চুপ করে কেন, শ্লোগান দাও।

আসাদ শ্লোগান দিলো, শহীদ স্মৃতি—

আর সকলে বললো, অমর হোক।

ছাত্রদের কাছ থেকে প্রথম প্রতিরোধ এলো লাইব্রেরির ভেতরের দরজায়, দুটো টেবিল টেনে এনে দরজার ওপর ব্যারিকেড সৃষ্টি করলো ওরা।

একটি ছেলে চিৎকার করে ডাকলো, আরো টেবিল আনো এদিকে, আরো, আরো।

দরজাটা আটকে ফেলো, যেন ঢুকতে না পারে।

ওদের এখানে ঢুকতে দেবো না আমরা।

না, কিছুতেই না।

ওরা যখন প্রতিরোধ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করছিলো, তখন কিছুসংখ্যক ছেলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে সেলফ থেকে কয়েকটা বই নামিয়ে সুবোধ বালকের মতো পড়তে বসে গেলো। বাইরে যে অতকিছু ঘটে গেলো যেন ওসবের সাথে কোনো যোগ ছিলো না ওদের। যেন অনেক আগে থেকে এমনি পড়ছিলো ওরা। এখনো পড়ছে।

ওদের দিকে চোখ পড়তে ঘৃণায় দেহটা বারকয়েক কেঁপে উঠল বেনুর। চোখজোড়া জ্বালাপোড়া করে উঠলো। একটা ছেলের হাত থেকে ছোঁ মেরে বইটা কেড়ে নিয়ে তীব্র গলায় যেন তিরস্কার করে উঠলো, আপনার লজ্জা করে না এখন বই পড়ছেন, ওদিকে আপনার বন্ধুদের কুকুরের মতো মারছে। আপনার লজ্জা করে না?

কয়েকটি ছেলে লজ্জা পেয়ে উঠে দাঁড়ালো।

কিন্তু কয়েকজন উঠলো না। আগের মতো বইয়ের পাতায় মনোনিবেশ করলো তারা।

একজন ছেলে গলা ছড়িয়ে বললো, থাক ওদের পড়তে দাও। কাপুরুষদের শান্তিতে থাকতে দাও। তোমরা সকলে এদিকে এসো। পুলিশগুলোকে এখানে কিছুতেই ঢুকতে দেবো না আমরা। কিন্তু পেছনের দরজা দিয়ে পুলিশগুলো ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে সেখানে। শুধু সেখানে নয়—মেয়েদের কমনরুমে, অধ্যাপকদের ক্লাবে, বাণিজ্য ভবনে, দোতলার করিডোরে— সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাণ্ডবনৃত্য শুরু হয়েছে পুলিশের।

ঘুমঘুম চোখে পায়ের শব্দটা কানে আসছিলো তার। ভেজানো দরজাটা ঠেলে কে যেন ঢুকল ভেতরে। পায়ের শব্দ ঘরের মাঝখানে এসে শ্লথ হয়ে গেলো, তারপর থেমে গেলো একসময়ে।

মাহমুদ চোখ মেলে তাকালো এতক্ষণে।

চোখেমুখে অপ্রস্তুত ভাব নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে ডলি।

ও আপনি? বসুন। শুয়েছিলো, উঠে বসলো মাহমুদ।

ওর দিকে ভালো করে তাকাতে সাহস হলো না ডলির। গত রাতের কথা মনে হতে অকারণে আরক্ত হলো সে। টিয়ে রঙের ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে সামনের কৌচটিতে বসে পড়লো ডলি। পরনে তার হলদে ডোরাকাটা শাড়ি, গায়ে সিফনের ব্লাউজ। চুলগুলো সুন্দর বেণি করা। কপালে চন্দনের একটা ছোট্ট ফোঁটা আর কানে একজোড়া সাদা পাথরের টব। ডলিকে বেশ লাগছিলো দেখতে।

বারকয়েক ইতস্তত করে ওর দিকে না-তাকিয়েই ডলি জিজ্ঞেস করলো, বজলের আসবার কথা ছিলো, ও কি এসেছিলো এখানে?

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওপাশের বড় জানালাটা খুলে দিলো মাহমুদ। তারপর বললো— এসেছিলো। আপনাকে বসতে বলে গেছে।

ডলি হতাশ হলো। আসবে তো বলে গেছে, কিন্তু কখন আসবে তার কি কোনো ঠিক আছে। এতক্ষণ কী করে এখানে অপেক্ষা করবে ডলি?

দুজনে চুপ করেছিলো।

মাহমুদ নীরবতা ভেঙে একটু পরে বললো, শহরের কোনো খবর জানেন?

ডলি প্রথমে ঠিক বুঝতে পারলো না। পরে বুঝতে পেরে বললো, না। কিছু জানে না সে।

মাহমুদ বললো, আসাদ রাহাতসহ অনেক ছেলেমেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

ডলি চোখ তুলে তাকালো ওর দিকে। কার কাছ থেকে শুনলেন?

কণ্ঠস্বরে ওর ব্যগ্রতা দেখে একটু অবাক না হয়ে পারলো না মাহমুদ।

বললো, সারা শহর জানে আর আপনি জানেন না।

এ কথার পর চুপ করে গেল ডলি। আর কোনো প্রশ্ন করল না। মাহমুদ লক্ষ্য করল ডলি যেন হঠাৎ বেশ গম্ভীর হয়ে গেছে। কিছু ভাবছে সে, কিন্তু অত গভীরভাবে কী ভাবতে পারে ডলি?

একটু পরে ডলি জিজ্ঞেস করল, কেন গ্রেফতার করা হলো ওদের?

মাহমুদ না হেসে পারলো না। হেসে বললো, বড় বোকার মতো প্রশ্ন করলেন আপনি। বিনে কারণে কি ওদের গ্রেফতার করা হয়েছে? ওরা আইন অমান্য করেছিল। ক্ষণকাল

থেমে মাহমুদ আবার বললো, ওদের নেতা—কী যেন নাম ছেলেটার— হ্যাঁ, মুনিম, ওকে নিশ্চয় চিনেন আপনি।

ডলি চমকে উঠে বললো, কই নাতো, আপনি কার কাছে শুনলেন ?

মাহমুদ মৃদু হেসে বললো, বজলের ও বন্ধু কিনা, তাই ভাবলাম সে ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে।

ডলি মাটিতে চোখজোড়া নামিয়ে রেখে ঈষৎ ঘাড় নাড়লো, না, বজলে ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়নি ডলির।

আলোচনার ধারাটা হয়তো অন্যদিকে নেয়ার জন্যেই একটু পরে ডলি জিজ্ঞেস করলো, উনি কোথায়, ওনাকে দেখছি না যে—

মাহমুদ বুঝতে না-পেরে বললো, কার কথা বলছেন ?

ওয়াইফ ? মাহমুদ যেন চিৎকার করে উঠল, আমার ওয়াইফ। তারপর হো হো করে হেসে ওঠে বললো, ও সাহানার কথা বলছেন ? কে বলেছে ও আমার ওয়াইফ ? ও নিজে বুঝি ?

ডলি ঘাড় নেড়ে বললো, না অন্যের কাছ থেকে শুনেছি।

কে সে ?

বজলে।

বজলে ? মাহমুদ আবার শব্দ করে হেসে উঠলো। তাহলে আপনি ভুল শুনেছেন। সাহানা আমার বোন। বলে হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলো সে।

ডলির ভালো লাগছিলো না। সবকিছু যেন কেমন অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিলো তার কাছে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একসময়ে উঠে দাঁড়ালো সে।

মাহমুদ সচকিত হয়ে বললো, এ কী আপনি চললেন নাকি ?

ডলি ওর দিকে না-তাকিয়েই বললো, বজলে এলে বলবেন, শরীরটা আমার খুব ভালো লাগছিলো না, তাই চলে গেলাম।

আচ্ছা তাই বলবো। ও চলে যেতে চাওয়ায় যেন স্বস্তি পেলো।

কে জানে, সাহানা সম্পর্কে যদি আরো কিছু জিজ্ঞেস করে বসতো ? ডলি চলে গেলে একটা সিগারেট ধরিয়ে মনে মনে বজলেকে গালাগালি দিলো মাহমুদ। আস্ত একটা ইডিয়ট। তারপর গুনগুন করে ইংরেজি গানের কলি ভাঁজতে লাগলো সে।

একটু পরে তাকেও বেরুতে হবে বাইরে।

॥ নয় ॥

লালবাগে যখন প্রথম পুলিশভ্যানটা এসে পৌঁছলো বেলা তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে। শুকনো ধুলো উড়ছে বাতাসে। হলদে রোদ চিকচিক করছে লালবাগের মাঠের ওপর, যেখানে একশো বছর আগে, দেশি সিপাহিরা বিদ্রোহ করেছিল বিদেশি বেনিয়াদের বিরুদ্ধে—সেই মাঠে।

পুলিশভ্যানটা গেটের সামনে এসে থামতে, কবি রসুলকে দেখতে পেলো আসাদ। পরনে তার একটি লুঙি। গায়ে কম্বল জড়ানো। ওদের দেখতে পেয়ে ছুটে এলো কবি রসুল। কোত্থেকে ধরেছে তোমাদের ?

ইউনিভার্সিটি থেকে।

এখানে ক'জন ?

এখানে আমরা আঠারোজন। আরো অনেককে ধরেছে। ওদেরও এখনি নিয়ে আসবে।

সকালে যারা ধরা পড়েছিলো, তারা সকলে ঘিরে দাঁড়ালো নতুন অভ্যাগতদের। হাতে হাত মেলালো ওরা। তারপর রাহাতের দিকে চোখ পড়তে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো, এ কী, ওর মাথা ফাটলো কেমন করে ?

আসাদ বললো, ইউনিভার্সিটিতে লাঠিচার্জ করেছে ওরা।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

পাশে একজন দারোগা দাঁড়িয়েছিলো। কবি রসুল তার দিকে তাকিয়ে রেগে উঠলো। কি সাহেব, তামাশা দেখছেন বুঝি ? ছেলেটা তো মারা যাবে। একটা ডাক্তার ডাকুন না।

এখানে ডাক্তার ডাকার কোনো নিয়ম নেই। দারোগা জবাব দিলো। বলেন তো তাকে হাসপাতালে পাঠাই।

হয়েছে, আপনাকে অত দরদ দেখাতে হবে না। সবুর মাটিতে থুতু ছিটিয়ে বললো। লোকগুলোকে দেখলে ঘেন্নায় বমি আসে আমার। যান যান-সাহেব, এখান থেকে দূরে সরে যান।

এমন অপ্রত্যাশিত অপমানকর কথা শুনে রাগে চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো লোকটার। কিন্তু কিছু বলতে সে সাহস করলো না। চুপচাপ সরে গেল একপাশে।

মেডিকেলের ছেলেরা বললো, আপনারা ঘাবড়াবেন না, জখমটা তেমন মারাত্মক নয়, আমরা ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছি। বলে ওরা এগিয়ে এসে রাহাতকে ধরাধরি করে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে বসালো। ওসমান খান বললো, একটু গরম পানি আর কিছু আয়োডিন দরকার। দাঁড়ান, দেখি জোগাড় করতে পারি কিনা। ওকে আশ্বাস দিয়ে থানা ইনচার্জের কাছ থেকে আয়োডিন আর গরম পানি আনার বন্দোবস্ত করতে গেল কবি রসুল।

পুলিশভ্যান থেকে নামবার আগপর্যন্ত আসাদ ভেবেছিলো সালমার সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়, তাহলে সে কি আগের মতো সহজভাবে কথা বলতে পারবে ?

গতরাতের কথা বারবার করে মনে পড়ছিলো তার।

থানা অফিসের পাশে লম্বা ব্যারাকটার সামনে আরো সাতটা-আটটা মেয়ের মাঝখানে বসে ওদের কী যেন বোঝাচ্ছিলো সালমা। দেখে আসাদ বুঝলো ওরা মেডিকেলের মেয়ে। সকালে হোস্টেল থেকে ধরা পড়েছে ওরা। কারো পরনে সেলোয়ার, কারো পরনে শাড়ি। আসাদকে দেখে ফিক করে হেসে দিলো সালমা। তারপর অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, বেশ আপনি ধরা পড়েছেন তাহলে ?

কী করবো বলুন, আপনাদের ছেড়ে থাকতে পারলাম না। আসাদের কথায় মুখখানা ঈষৎ রাঙা হয়ে উঠলো সালমার। চোখজোড়া মাটির দিকে নামিয়ে পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে গেলো সে। কে জানে হয়তো গতরাতের কথা মনে পড়েছে তার, আসাদ ভাবলো।

একটু পরে সালমা ইতস্তত করে বললো, আমরা ভোররাতেই এ্যারেস্ট হয়েছি।

হ্যাঁ, আমি তা শুনেছি।

কার কাছ থেকে শুনলেন ? ভ্রূজোড়া স্বল্প বাঁকিয়ে প্রশ্ন করলো সালমা। আসাদ বললো, আপনার সহপাঠীদের কাছ থেকে।

ও, সালমা মৃদু হেসে মুখখানা অন্যদিকে ঘুরিয়ে আরেকটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। না, গতরাতের কথা এখন আর মনে নেই তার। সব ভুলে গেছে মেয়েটি, আসাদ ভাবলো। ভেবে কেন যেন মনটা ব্যথায় টনটন করে উঠলো তার।

ভার্সিটির মেয়েদের নিয়ে তখন দ্বিতীয় প্রিজন-ভ্যানটা এসে পৌঁছেছে লালবাগে। ওদের দেখতে পেয়ে শিশুদের মতো আনন্দের হাততালি দিতে-দিতে সেদিকে এগিয়ে গেলো মেডিকেলের মেয়েরা। এই যে নীলা যে, এসো এসো। ছুটে এসে ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো সালমা। রানু বললো, বাহ্ সালমা আপা তুমি ? বেশ ভালোই হলো, একসঙ্গে থাকা যাবে।

সালমা জিজ্ঞেস করলো, তোমরা ক'জন।

নীলা জবাব দিলো, পাঁচ।

তাহলে পাঁচ আর আট মিলে আমরা তেরোজন হলাম।

হ্যাঁ, তেরোজন মেয়ে আমরা, সালমা বললো।

আসাদ কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। ফোড়ন কেটে বললো, আমাদের তুলনায় কিন্তু সমুদ্রে বারিবিন্দু।

হয়েছে হয়েছে, অত বড়বড় কথা বলবেন না। নীলা ঠোঁট বাঁকালো। দেখেছি আপনাদের সাহস। পুলিশ দেখে সব বেড়ালের মতো পালিয়েছেন, আবার কথা বলেন।

আমরা পালাইনি হুঁ।

উত্তরে কী যেন বলতে যাচ্ছিল আসাদ। এমন সময় আরো এক পুলিশভ্যান এসে থামলো সেখানে।

আরো একদল ছেলে।

আরো একদল মেয়ে।

তারপর বেলা যত পড়তে লাগলো, গ্রেফতার করে-আনা ছেলে-মেয়ের সংখ্যাও তেমনি বাড়তে লাগল ধীরেধীরে।

কাঁটাতার আর পুলিশ-ঘেরা মাঠটার মধ্যে গোল হয়ে বসলো ছেলেরা মেয়েরা। আর তারা প্রতীক্ষা করতে লাগলো কখন জেলখানায় নিয়ে যাবে। তাদের সকলের মুখে হাসি, চোখে শপথের কাঠিন্য।

হঠাৎ একসময়ে সবার মাঝখান থেকে অপূর্ব দরদ নিয়ে নীলা গান গেয়ে উঠলো, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—।

তারপরে সে গাইলো, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

ওর গান শুনে কিছুক্ষণের জন্যে সবাই যেন বোবা হয়ে গেল। কী এক গভীর মৌন চারপাশে থেকে এসে গ্রাস করলো ওদের।

খানিকক্ষণ পরে আবার কলকল করে কথা বলে উঠলো ওরা। কবি রসুল একজন দারোগাকে ডেকে বললো, কী ব্যাপার, আমাদের কি এখানে ফেলে রাখবেন নাকি ?

আর একজন জিজ্ঞেস করলো, জেলখানায় কখন নেবেন ? এখানে আর ভালো লাগছে না। জেলে নিতে হয় নিয়ে চলুন। উহ্, এই ফাঁকা মাঠের মধ্যে কতক্ষণ ধরে থাকা যায়। দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি করুন না আপনারা।

ওদের হৈ-হট্টগোলের একপাশে চুপচাপ বসেছিলো মুনিম। লাঠির আঘাত লেগে বাঁ-চোখটা ফুলে গেছে ওর। নীলার গান শুনে বারবার ডলির কথা মনে পড়ছে। ডলিও

তো নীলার মতো আসতে পারতো এখানে। কেন সে এলো না ? ভাবতে গিয়ে বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো মুনিমের।

ওকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বেনু এসে বললো, কী ভাবছো মুনিম ভাই ?

না, কিছু না। চোখ তুলে বেনুর দিকে তাকালো মুনিম। দেহের গড়নটা ওর একটু ভারী গোছের। চেহারাখানা সুন্দর আর কমণীয়। সবার সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলে বেনু। কোন আবিলতা নেই, কলুষতা নেই, আর কাজ পেলে কী খুশিই না হয় মেয়েটা ! দু-হাতে কাজ করে। ওর দিকে তাকিয়ে মুনিমের আবার মনে হলো, ডলি কেন বেনুর মতো হলো না।

বেনু ওর পাশে বসলো।

ফোলা চোখটার দিকে দৃষ্টি পড়তে বললো, লাঠির আঘাত লেগেছিলো, তাই না মুনিম ভাই ?

মুনিম সংক্ষেপে বললো, হ্যাঁ।

বেনু বললো, মেডিকেলের ছেলেদের বললে ওরা সুন্দরভাবে ব্যান্ডেজ করে দেবে। বলবো ওদের ?

বেনুর উৎকণ্ঠা দেখে অবাক হলো মুনিম।

বেনু আর কিছু বললো না। চুপচাপ, রোদে চিকচিক-করা অসমতল মাঠটার দিকে চেয়ে রইলো।

অদূরে বসা সালমা আসাদকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এর আগে কোনোদিন জেলে যাননি ?

গেছি।

ক'বার ?

তিনবার।

ভাই নাকি ?

হ্যাঁ। আসাদ মৃদু হাসলো। চেয়ে দেখলো মাটির দিকে চোখ নামিয়ে কী যেন ভাবল সালমা। কে জানে হয়তো গতরাতের কথা ভাবছে সে। কিম্বা ভাবছে তার কারারুদ্ধ স্বামীর কথা। কী ভাবছে জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না আসাদের।

মাঠের এ-পাশটায় এরা বসেছিল।

ও-পাশটায় তখন কবি রসুল একজন পুলিশঅফিসারের ওপর রেগে গিয়ে বলছে, এই রোদের ভেতর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবেন এখানে। জেলে নেবেন না নাকি ?

নেবো, নেবো, এত ধৈর্য হারাচ্ছেন কেন। এখনি নেবো। জবাবটা তাড়াতাড়ি সেরে সেখানে থেকে তাড়াতাড়ি সরে গেল পুলিশ অফিসারটা।

সবুর মাটিতে থুতু ছিটিয়ে বললো, লোকগুলোকে দেখলে ঘেন্নায় বমি আসে আমার, তোমরা কেমন করে যে ওদের সঙ্গে কথা বলো—। আবার মাটিতে থুতু ছিটালো সে।

কেউ কিছু বললো না।

পরদিন তিন-চারখানা পুলিশ-বোঝাই গাড়ি উত্তর থেকে দ্রুত দক্ষিণদিকে চলে গেলো। একনজর সেদিকে তাকিয়ে দেখলো বজলে, তারপর মৃদুপায়ে আবার হাঁটতে লাগল।

ফিরেন্তারে বসে এককাপ চা খাবে।

কাচের দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে সাহানাকে একা বসে থাকতে দেখে সেদিকে এগিয়ে গেলো বজলে।

ওকে দেখতে পেয়ে সাহানা ম্লান হাসলো। চা খেতে এলেন বুঝি?

বজলে ওর সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে বললো, হ্যাঁ। আপনি খেয়েছেন?

হ্যাঁ।

আরেক কাপ খান আমার সঙ্গে।

সাহানা হ্যাঁ-না কিছু বললো না। বয় এসে দাঁড়িয়েছিলো, বজলে দু-কাপ চা আনতে বললো তাকে।

বয় চলে গেলে বজলে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো, এখন কোথায় আছেন আপনি?

সাহানা সে-কথার কোনো জবাব না-দিয়ে স্থিরচোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বজলের দিকে। তারপর বললো, মাহমুদের সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছিলো এর মধ্যে?

বজলে বললো, হ্যাঁ। সকালে ওর ওখানে গিয়েছিলাম আমি।

সাহানা মাথা নিচু করে কয়েকমুহূর্ত নীরব থেকে বললো, আমি এখন সেগুনবাগানে আমার এক বান্ধবীর বাসায় আছি।

ও! বজলে মৃদুস্বরে বললো।

বয় এসে চা রেখে গেলো টেবিলের উপর।

পটের ভেতর একচামচ চিনি ঢেলে দিয়ে সাহানা বললো, ও নিশ্চয় আমার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছে আপনাকে।

বজলে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে অবশেষে বন্ধুর পক্ষ নিয়ে বললো, না ও কিছু বলেনি আপনার সম্পর্কে।

নিশ্চয় বলেছে, আপনি লুকোচ্ছেন আমার কাছ থেকে। অদ্ভুতভাবে হাসলো সাহানা। পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে আবার বললো, জানেন, লোকটা বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিলো আমায়। আর এখন বলে, না আমি ওরকম কোনো কথা দিইনি। ক্ষণকাল থেমে আবার বললো সে, তখন কত অনুনয়, তোমার ভালোবাসা পেলে স্বর্গমর্ত্য এক করে দেবো, আর এখন? জোচ্চর কোথাকার।

বজলে মাথা নিচু করে ছিল। চোখ তুলে এবার তাকালো ওর দিকে। পরনে একখানা কলাপাতার রঙের পাতলা শাড়ি সাদা ব্লাউজ। ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক লাগানো। চুলগুলো গোলাকার খোঁপা-করা। ডলির চেয়ে কম সুন্দরী নয় সাহানা। চায়ের কাপটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে সাহানা আবার বললো, ও ভেবেছে চিরকাল আমি ওর করুণায় ভিখারি হয়ে থাকি। উর্বর চিন্তা বটে। বলে অদ্ভুতভাবে হাসলো সাহানা। তারপর চায়ের পেয়ালায় মৃদু চুমুক দিয়ে বললো, থাক ওসব কথা, আপনার কী খবর বলুন। চা খেয়ে বেরিয়ে কোথায় যাবেন?

বজলে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, কিছু ঠিক নেই, এমনি একটু ঘুরে বেড়াবো।

সাহানা বললো, আমার ওখানে চলুন না।

বজলে শুধালো, কোথায়।

সেগুনবাগানে। শুকে অবাক করে দিয়ে অপূর্ব গলায় সাহানা বললো। ওরা সবাই দেশের বাড়ি গেছে। বাসাটা খালি। রাতের বেলা একা থাকতে বড় ভয় করবে আমার। চলুন না, আপনিও থাকবেন। সাহানার দু-চোখে আশ্চর্য আমন্ত্রণ।

চুল থেকে পা পর্যন্ত ওর পুরো দেহটার দিকে একপলক তাকালো বজলে। ডলিকে মনে পড়লো। ও যদি জানতে পারে ? না, ও মোটেই জানতে পারবে না। সিগারেটে একটা জোরে টান দিলো বজলে। তারপর কাঁপা গলায় বললো, আচ্ছা যাবো।

ওর চোখে চোখ রেখে ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসি ছড়ালো সাহানা।

মিরেন্ডার থেকে বেরিয়ে একখানা রিকশা নিলো ওরা। ওর কানের কাছে মুখ এনে বজলে কী যেন বলতে যাচ্ছিলো। সাহানা বললো, ডলি গেলো।

ডলি ? বজলে আঁতকে উঠলো। কোথায় দেখলেন তাকে ?

সাহানা বললো, এইতো রিকশা করে গেলো ওদিকে।

মুহূর্তে মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল বজলের।

ও কি দেখেছে আমাদের ?

সাহানা হেসে দিয়ে বললো, তা কেমন করে বলবো। বলে ওর হাতে একটা মৃদুচাপ দিলো সাহানা। ওর হাতখানা মুঠোর মধ্যে নিয়ে নীরবে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলো বজলে। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ফ্যাকাশে দৃষ্টি মেলে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো সে।

হৃদপিণ্ডটা গলার কাছে এসে ধুকধুক করছে।

আকাশের পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছিলো ধীরেধীরে।

দিনের ক্লান্তি শেষে, রাত তার স্নিগ্ধতা নিয়ে আসছিলো পৃথিবীর বুকে। কর্মচঞ্চল শহর রাত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই বিষণ্ন বিকেলে হঠাৎ মৌন গভীর সমুদ্রে ডুব মেরেছিলো যেন।

জেলগেটের সামনে বন্দি ছাত্র-ছাত্রীদের জড়ো করা হলো এনে। একজন নয়, দুজন নয়। আড়াইশোর ওপর সংখ্যা ওদের।

খবর পেয়ে আত্মীয়-স্বজনেরা খোঁজ নিতে এসেছেন। কার কী প্রয়োজন কাগজে টুকে নিচ্ছে চটপট।

সালমার বিছানাপত্তর আর কাপড়চোপড় নিয়ে শাহেদ এসেছিলো। হোল্ডঅল আর সুটকেসটা সামনে নামিয়ে রেখে বললো, নে আপা তোর জিনিসপত্রগুলো সব দেখে নে। আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে, জলদি কর।

কেন, তুই কোথায় যাবি ? সালমা উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করলো। শাহেদ বললো, বারে, তোদের যে ধরে এনেছে তার প্রতিবাদে ধর্মঘট করবো না বুঝি ?

সালমা মনে-মনে খুশি হলো। বললো, দেখো, তুমি যেন দুষ্টুমি করো না। তাহলে কিন্তু খুব রাগ করবো।

তুই আমায় কী মনে করছিস আপা। আমি দুষ্টুমি করি ? শাহেদ আহত হলো। এইতো এখন গিয়ে পোস্টার লিখতে বসবো। পাড়ার ছেলেদের সব বলে রেখেছি। আজ রাতের মধ্যে দুশো পোস্টার লাগানো চাই, কী মনে করছিস তুই ? বলে চলে যাচ্ছিলো শাহেদ। কী মনে পড়তে ফিরে এসে পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে এগিয়ে দিলো সালমার দিকে। দিতে ভুলেই যাচ্ছিলাম। নে, দুলাভাইয়ের চিঠি। হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিলো সালমা।

আসাদ বললো, কার চিঠি ?

সালমা ওর দিকে না-তাকিয়েই জবাব দিলো—ও লিখেছে, রাজশাহী জেল থেকে। আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিলো সালমা। নীলা ডাকলো, সালমা এসো। আমাদের নাম ডাকছে।

অস্ফুট কণ্ঠে 'আসি' বলে, চলে গেলো সালমা।

গতরাতের কথা সে একেবারে ভুলে গেছে। স্বামীর চিঠিখানা কত যত্ন করে রেখেছে হাতের মধ্যে, আসাদ ভাবলো।

আর ভাবতে গিয়ে মনটা কেন যেন ব্যথা করে উঠলো তার।

সাহানাকে দেখে তেমন অবাক হয়নি মুনিম, জানতো সে আসতে পারে। অবাক হলো ওর সঙ্গে ডলিকে দেখে।

সাহানা বললো, ডলি এসেছে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

প্রথমে কিছুক্ষণ একটা কথাও মুখ দিয়ে সরলো না মুনিমের। অপ্রত্যাশিত আনন্দে বোবা হয়ে গেছে সে।

ডলি এগিয়ে এসে একমুঠো ফুল গুঁজে দিলো ওর হাতের মধ্যে। কিছু বললো না। মাটিতে চোখ নামিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো।

মুনিম মৃদুস্বরে বললো, হয়তো দীর্ঘদিন আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না ডলি।

ডলি চোখ তুলে তাকালো ওর দিকে।

স্বল্প অন্ধকারেও মুনিম দেখলো, ডলির চোখজোড়া পানিতে ছলছল করছে। আনন্দে মনটা নেচে উঠছিলো বারবার। আর সে শুধু চেয়ে-চেয়ে দেখছিলো ডলিকে। ডলির এমন রূপ আর কোনোদিন চোখে পড়েনি মুনিমের।

আসাদ এসে ওর কাঁধের ওপর একখানা হাত রাখলো। তোমার বাসা থেকে কেউ আসেনি মুনিম?

আমেনা এসেছিলো। মুনিম জবাব দিলো। কাপড়চোপড়গুলো ওই দিয়ে গেছে। মা নাকি খবর শুনে কাঁদতে শুরু করেছেন। মাকে নিয়ে আমার এক জ্বালা। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলো মুনিম।

আসাদ সরে গেলো অন্যদিকে। ওর কেউ আসেনি। মা যার নেই, দুনিয়াতে কেউ বুঝি নেই তার। হঠাৎ মরা মায়ের কথা মনে পড়ায় মনটা আরো খারাপ হয়ে গেলো আসাদের। নাম ডেকে-ডেকে তখন একজন করে ছেলেমেয়েদের ঢোকানো হচ্ছিলো জেলখানার ভেতর।

নাম ডাকতে ডাকতে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন ডেপুটি জেলার সাহেব। একসময়ে বিরক্তির সাথে বললেন, উহু, এত ছেলেকে জায়গা দেবো কোথায়। জেলখানা তো এমনিতে ভর্তি হয়ে আছে।

ওর কথা শুনে কবি রসুল চিৎকার করে উঠলো, জেলখানা আরো বাড়ান সাহেব। এত ছোট জেলখানায় হবে না।

আর একজন বললো, এতেই ঘাবড়ে গেলেন নাকি? আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো।